আনন্দমেলা

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৫

১

আনন্দবাজার-প্রকাশন

nbt

এ বছর আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ

কোনো ছোট্ট বন্ধুর জন্য এ মাসে কোনো বই কিনেছেন কি ?

মন ভুলানো গল্প, চেয়ে থাকার মতো ছবি আর অবাক হবার মতো নতুন নতুন বিষয়—এই নিয়ে আমাদের ছোটদের বই

মূল্য ঃ দেড় টাকা এবং আড়াই টাকা

এন বি টি বুক সেণ্টার ৬৭/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

অন্যান্য যাদের কাছে আছে

ষ্টার বুক হাউস ৬৫-এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ● **উষা পাবলিশিং হাউস** ১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭২ ● **ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স** ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ● **সিনহা বুক এজেন্সী** ৭৯/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ● **সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সী** ২২, রাজা উডমান্ট ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১ ● **চৌধুরী সেলস কনসার্ন** তিনকোনিয়া, বর্দ্ধমান ● **সেলস এম্পোরিয়াম, পাব্লিকেশন্স ডিভিশন** ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-১

ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ইণ্ডিয়া

আনন্দমেলা

৩ পৌষ ১৩৮৬ • ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭৯ • ৫ বর্ষ • ১৫ সংখ্যা

বিশেষ রচনা
ভাটিকান । পবিত্র সরকার ৪
গল্প
ঘণ্টাকর্ণের কান গেল । মনোজ বসু ১০
জলরঙ । বিজয় পাল ৩৯
ঝড়তুফানের রাজা । সুনন্দা দাশগুপ্ত ৪৩
উপন্যাস
কে । বিমল মিত্র ১৫
পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৭
আত্মকথা
খেলতে-খেলতে । চুনী গোস্বামী ৩৭
ছড়া
তোর কী । আশা দেবী ২৫
ঘোড়ার ডিম । রবিদাস সাহারায় ২৫
চিত্রকাহিনী ও কমিকস
সদাশিব ১৯, রোভার্সের রয় ২০, টিনটিন ২২
বিশ্বকাপ ২৪, টারজান ২৬, বাঘা ৬০, গাবলু ৬৪
লেখাপড়া
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৬৩
খেলাধুলো
জাদুকর ধ্যানচাঁদ ৩৩
ইনিংস গড়ার কারিগর । রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৫১
ঠাণ্ডা লড়াই । অভিমন্যু ৫৩
দিল্লি-টেস্ট ৫৫
আশি মিনিটের জোর লড়াই । অলোক দাশগুপ্ত ৫৫
প্রসূনের বাঁ পা । অশোক দাশগুপ্ত ৫৭
অন্যান্য আকর্ষণ
মালিনীর কথা । তুষার পণ্ডিত ৩৩
ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, ছবির মজা ৪২,
তোমাদের পাতা ৪৭, নদনদী ৫৯,
আঁকো-শেখো ৬৬
মজিদ খাঁর পুরোপাতা রঙিন ছবি ৫০
প্রচ্ছদ চিত্রজিৎ ঘোষ

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাংপাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

সরস্বতী পুজোর চিন্তা

শুধু মন্ত্রপাঠ নয়, ভক্তি,
শুধু আনন্দ নয়, পড়াশোনা;
কেবল হুজুগে ভেসে যাওয়া নয়
চাই সংযম।

এগুলো সবই আসন্ন সরস্বতী
পুজোর কথা মনে করে বলছি।

কারণ এই পুজোর অর্থটাই আজ
আমরা হারিয়ে ফেলেছি।
আজ পুজোর মানে দাঁড়িয়েছে :-

আরও চাঁদা, দামী প্রতিমা, এ তল্লাটের
সেরা ডেকরেটর। বিদ্যুৎ ঘাটতি
উপেক্ষা করে আলোর মালা।

কিন্তু তাতেই কি সরস্বতীর আশীর্বাদ
পাওয়া যাবে ? এটাই কি বিদ্যার আরাধনা ?

আজ শিক্ষার নামে যে অশিক্ষার
হাহাকার চলছে, চারপাশে অজ্ঞানতার
যে গাঢ় অন্ধকার ছেয়ে আসছে, তা দূর
করতে হবে। জ্ঞানের আলো
জ্বেলে নিজের মনটাকে
আলো করতে হবে।

এ প্রশ্নগুলি নিশ্চয়ই
তোমাদের মনেও আসে
বা আসছে।
কারণ একদিকে যেমন
শিক্ষা ব্যবস্থা আছে, অন্যদিকে
অশিক্ষিতের সংখ্যাও অনেক।
বহু ছেলেমেয়ে অল্প বয়স
থেকেই রুজিরোজগারের জন্য
কাজে লেগে যায়—
তারা প্রাথমিক শিক্ষাও
পায় না।

এই যখন পরিস্থিতি
তখন বিদ্যাদেবীর আরাধনা
কি শুধু মন্ত্রপাঠ, হৈ চৈ
আর চাঁদা আদায়েই থাকবে—
নাকি, শিক্ষার বিস্তার,
অক্ষর পরিচয় করানো ইত্যাদি
ক্ষেত্রেও আমাদের দায়িত্ব
থেকে যায় ?

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ
৩-এ অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে
প্রচারিত)

সেন্ট পিটার্স ক্যাথিড্রাল (ভাটিকান)

ভাটিকান

পবিত্র সরকার

কথাটা তোমাদেরই জিজ্ঞেস করি।

ধরো ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াল : দেখতে গেছ একটা দেশ, তার রাজধানীতে উঠেছ। কিন্তু আর দু-চার টাকা বাসভাড়া দিলেই দেখে আসতে পারো আরেকটা স্বাধীন দেশ। হোক সেটা পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম স্বাধীন রাষ্ট্র, হলই বা পাঁচিলঘেরা সে-রাষ্ট্রের সবটাই দেখতে হবে পায়ে হেঁটে। সে রাষ্ট্রের দেশ বলতে ঐ রাজধানীর শহরটুকু, আর রাজধানীর শহর বলতে যতখানি জায়গা—তাকে তুমি কলকাতার একটা পাড়ার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বসিয়ে দিতে পারো, থাকুক না তার নিজের খবরের কাগজ, রেডিয়ো স্টেশন, হেলিপ্যাড, রেল স্টেশন।

রোমের স্তাৎসিঅনে তোরমিনি অর্থাৎ টার্মিনাল স্টেশন থেকে যখন চৌষট্টি নম্বর বাসে চড়ে বসলাম তখন যে এসবই শুধু ভাবছিলাম তা নয়। বাস স্টেশনমুখের পিয়াৎসা ডেল চিকেচিন্তো থেকে বাঁ দিকে দক্ষিণে মোড় ঘুরল—রোমের দীর্ঘ রাস্তা ভিয়া নাৎসিওনালে কোর্সো ভিত্তোরিয়ো এমানুয়েলে ধরে যাবে কাজেই ভাববার সময় ছিল অনেকখানি। ভাটিকান পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র হলে কী হবে, মাত্র ১০৮ একরের এ রাষ্ট্রের যিনি অধীশ্বর, পৃথিবীর বহু সম্রাট তাঁর কাছে একসময় মাথা নুইয়েছেন। এখন পৃথিবীর সমস্ত রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় রাজধানী এই ভাটিকান—এর প্রধানতম পুরুষ পোপ কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের রাজা, কোটি কোটি মানুষ তাঁর আশীর্বাদের কাঙাল। শুধু তাই নয়, এই ক্ষুদ্র প্রাচীর-ঘেরা শহরটির ঘরগুলির মধ্যে যে অসামান্য অনুপম শিল্পসম্পদ আশ্রিত আছে পৃথিবীর অনেক বিরাট দেশও তা পাবার জন্য প্রায় সবকিছু দিয়ে দিতে পারে।

এইসব ভাবতে-ভাবতেই দেখি বাস টাইবার নদী পার হচ্ছে, খুব কাছাকাছি এসে গেছে ভাটিকান। প্যারিসের সীন নদী দেখে যেমন খুব হতাশ হয়েছিলাম, ইতিহাসবিখ্যাত টাইবার দেখেও তেমনি দমে গেলাম। সীন ছিল নোংরা জলের খাল, আর টাইবার মজে-যাওয়া নালাটি যেন,—দুপাশে এগিয়ে-আসা আগাছা-ভর্তি পাড়ের মধ্য দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে এঁকেবেঁকে পথ কেটে চলেছে।

মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই বাস ভাটিকানের

উত্তর-পশ্চিমের গেটটির কাছে এসে দাঁড়াল। এটি ভিয়া দি পোর্তা অঞ্জেলিকা থেকে মানুষজনকে সোজা ভাটিকানের বিশাল চত্বরের মধ্যে পৌঁছে দেয়। চত্বরে ঢুকেই তোমাকে খানিকটা চুপচাপ হয়ে যেতে হবে, মনে হবে আধুনিক পৃথিবীর বাইরে তুমি অন্য কোথাও এসে পড়েছ। শহরের শব্দ সব স্তব্ধ হয়ে গেল, বাড়িঘর রাস্তাঘাট পার্ক-পিয়াৎসার সুপরিচিত সব নকশা অন্তর্হিত হয়ে গেল— আর-এক জগতে তুমি পৌঁছে গেলে, যেখানে বিরাট, মহৎ, সুন্দর এই ভাবগুলি তোমার মনের মধ্যে আপনিই জেগে ওঠে। প্রায় অন্ত-

সুইস গার্ড

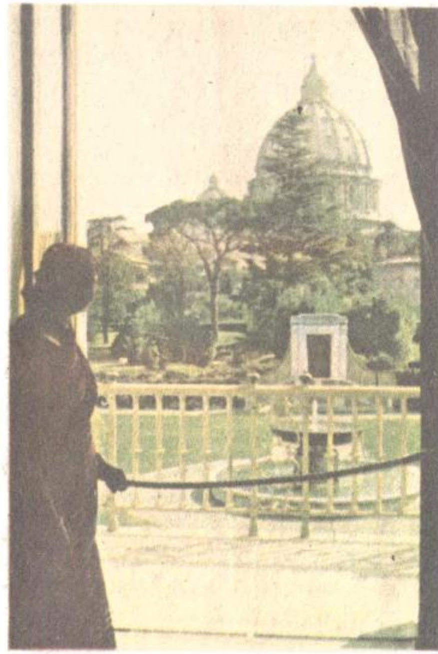

ভাটিকান (সিস্টিন চ্যাপেল থেকে)

ম্যাডোনা

হীন বৃত্তাকার চত্বর একদিকে খুলে গেছে প্রশস্ত রাজপথ ভিয়া দেল্লা কনচিলিয়াৎসিঅনের দিকে আরেক দিকে তা পৌঁছেছে খ্রীষ্টধর্মের বিশালতম ও সুন্দরতম মন্দির সেন্ট পিটারের ক্যাথিড্রালে। সে চত্বরের দু-পাশে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে আছে ছাদঢাকা বিরাট বিরাট থামের দু'সারি 'কলোনেড'—বিখ্যাত ভাস্কর বের্নিনির অনন্যসুন্দর সৃষ্টি। গেট দিয়ে ঢোকবার সময় মনে হয়েছিল বেশ ভিড়, ঢুকেই দেখি সে ভিড় সেই আকাশের মতো চত্বরে ছিটকে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তখন ঠিক কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকা একটা আস্ত পাথর থেকে কেটে নেওয়া স্তম্ভ বা 'ওবেলিস্ক'টি, তার দু-পাশে ঠিক সমান দূরত্বে উচ্ছ্রিত জল-বিন্দুতে রামধনু তৈরি করতে ব্যস্ত দুটি চমৎকার ফোয়ারা, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষ, চত্বরে খাবার খুঁটতে থাকা কিছু পায়রা—সব-কিছুর উপর যেন একটা অন্যরকম নৈঃশব্দ্য নেমে এল। যেন প্রাচীন শতাব্দীরা এসে আমাদের আলতো করে তুলে নিল বর্তমানের নাগাল থেকে। এই চত্বরে, যার নাম পিয়াৎসা সান পিয়েত্রো অর্থাৎ ধরো সেন্ট পিটার্স স্কোয়ার, তার মাঝখানে মস্ত এক আকাশের চাকতি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে তোমার এইরকম একটা হারিয়ে-যাওয়ার মতো অনুভব জাগবে।

সেন্ট পিটারের গির্জার দিকে এগোচ্ছি, একজন বললেন, এই ডানদিকের লম্বা বাড়িটায় থাকেন মহামান্য পোপ। আমরা যখন গেছি তখন পোপ রয়েছেন ষষ্ঠ পল। তাঁর প্রাসাদের মূল দরজাটির নাম 'ব্রোঞ্জ ডোর'—তার সামনে দেখি বিরাট এক লাইন পড়েছে। সুট, টাই, বুকে পরিচয়জ্ঞাপক ব্যাজ পরা সেই সমাবেশের একটু কাছে গিয়ে দেখি এঁরা সবাই ডাক্তার, মস্তিষ্কের সার্জারির উপর একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এসেছেন রোমে, সেই উপলক্ষে মহামান্য পোপকেও দর্শন করে যাবেন। কাছেই একজন ভারতীয়-চেহারার ভদ্রলোকের উপর গিয়ে দৃষ্টি ধাক্কা খেল। তিনি হেসে ডাকলেন,

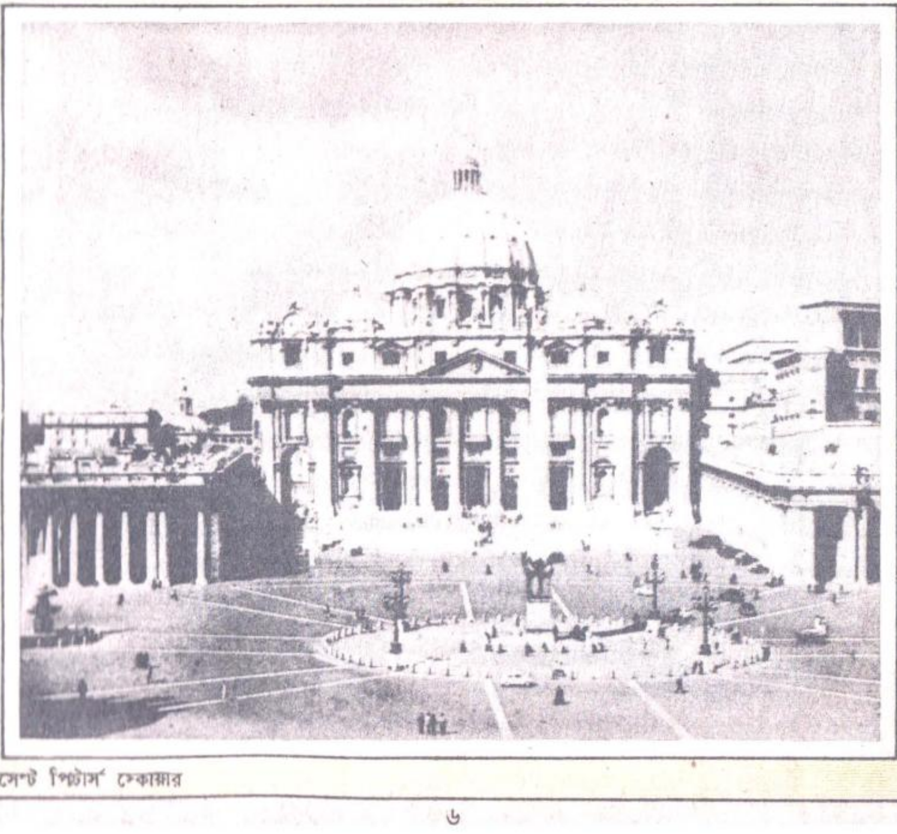

সেণ্ট পিটার্স স্কোয়ার

বললেন, "আমি ডাঃ সেঠনা, আমেদাবাদ থেকে এসেছি।" আলাপ সাঙ্গ হলে আমন্ত্রণ জানালেন, "আপনিও দাঁড়িয়ে যান মশাই আমাদের সঙ্গে, অত কে দেখছে!" কিন্তু আমাদের হাতে সময় ছিল না, মহামান্য পোপকে দর্শন করবার সেই সুবর্ণসুযোগ ছাড়তে হল।

এবার সেন্ট পিটারের গির্জার মুখোমুখি দাঁড়ালাম। এখন যেখানে যাব সে জায়গা যে পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ ধর্মস্থান তা নয়, পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রদর্শনীও বটে। এর অসামান্য সুন্দর গম্বুজটি প্রার্থনার মতো করে আকাশ ছুঁয়েছে, এটির পরিকল্পনা করেছিলেন মিকেলেঞ্জেলো — চিরকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন। ঢুকতে গিয়ে মাথার উপরে যে-পোর্টিকোটি পড়ে, তাতে একটি ফ্রেস্কো করেছিলেন জত্তো—সেই ১৩০০ খৃষ্টাব্দে। সত্যি বলতে কী যেদিকে তাকাবে সেদিকেই তোমার চোখ গিয়ে পড়বে এমন কিছুর উপর —ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'মাস্টারপীস'— শিল্পের অপরূপ ও অত্যুত্তম নিদর্শন। কোন্ দিকে চোখ ফেরাবে তুমি?

বারান্দায় গিয়ে খবরাখবর নেবার ডেস্কের দিকে এগোতে যাব—ও মা, দেখি দুটি ভারতীয় সন্ন্যাসিনী হাসিমুখে আসছেন আমাদের দিকে। কাছে এসে শিশুটিকে গাল টিপে আদর করলেন, বললেন, "কোনো খবর নেবার দরকার নেই, গাইডওয়ালা কোনো দলের সঙ্গে তোমরা ভিড়ে যাও, তাহলেই সব জানতে পারবে।" দুজনেই দক্ষিণ-ভারতের মেয়ে, একজন কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরের আরেকজন কেরলের কোচিন অঞ্চলের। আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে গির্জার বিশাল সেই হলঘরে ঢুকে পড়লাম।

এই বিরাট আয়তক্ষেত্রাকার গির্জাঘর বা 'ব্যাসিলিকা'টি ৬৯১ ফুট লম্বা। এর নীচে সমাহিত আছে রোম-সম্রাট নিরোর আমলে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মহাপ্রয়াত খৃষ্টীয় সন্ত পিটারের মরদেহ। ইতিহাস বলে, এখানেই

সেন্ট পিটার্স স্কোয়ার (উপর থেকে ভাটিকানের দৃশ্যাবলি)

বার্নিনির ফোয়ারা,

ছিল নিরোর বিখ্যাত ও ভয়ংকর সার্কাস। এখানে নিরস্ত্র মানুষকে লড়াই করতে হত ক্ষুধার্ত সিংহের সঙ্গে: পালিয়ে-যাওয়া ক্রীতদাসদের যখন ধরে আনা হত, তখন তাদের দুজনকে লড়াইয়ে লাগিয়ে দেওয়া হত এই সার্কাসেই—যতক্ষণ না একজনের মৃত্যু হয়। সেই বীভৎস নিষ্ঠুরতা, রক্তপাত ও মৃত্যুর উপর এখন নেমেছে শান্তি ও করুণার যবনিকা, সেন্ট পিটারের গির্জার ভিতরে তার স্মৃতি আর কোথাও নেই।

যে-দলটির সঙ্গ নিয়েছিলাম, গাইড তাদের এক-একটি চ্যাপেলে নিয়ে যাচ্ছে, বোঝাচ্ছে তার মহিমা—অনেকেই হাঁটু গেড়ে বসে বুকে ক্রস আঁকছে। সর্বত্রই একটা ভক্তি-ভক্তি ভাব—সেই বিপুল প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের মধ্যে নাস্তিকেরও মাথা নুয়ে আসে। আমরা বাঁ দিকের চ্যাপেলগুলো দেখে সেন্ট পিটারের সমাধির কাছে গেলাম। সেখানে উঁচু বেদী—মিকেলেঞ্জেলোর সেই গম্বুজের ঠিক নীচে এটি—তার কাচের অলিন্দগুলি থেকে সূর্যের প্রসন্ন আলো এসে পড়ছে বেদীটির উপরে। মস্ত মস্ত মোমবাতি জ্বলছিল অনেকগুলি। শুনলাম পঁচানব্বইটি সবসুদ্ধ—কখনো তাদের শিখা নেবে না।

কনফেশন এলাকা, স্মৃতিস্তম্ভ, চ্যাপেল খ্রীষ্টীয় সন্তদের মূর্তি তো অসংখ্য দেখলাম, কিন্তু যা মনের মধ্যে উজ্জ্বলতম হয়ে জেগে আছে তা মিকেলেঞ্জেলোর অনুপম ভাস্কর্য—'পিয়েতা' বা 'করুণা'—ডান দিকের প্রথম চ্যাপেলেই এটি রাখা। মা মেরি তাঁর সন্তানকে ক্রস থেকে নামিয়ে এনেছেন, তাঁর মুখে অলোকসামান্য বিষণ্ণতা ও বেদনা। আর খ্রীষ্ট যেন মার কোলে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছেন পরম নির্ভাবনায়।

ভাবতে পারো, কিছুদিন আগে একজন এসে হাতুড়ি দিয়ে মা মেরির ঐ মূর্তিটির নাকের খানিকটা ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল? সকলেই বলছে সে পাগল, কিন্তু এমন পাগল খুনীর চেয়ে ভয়ংকর। এখন অবশ্য ইতালীয় শিল্পীরা নিপুণ হাতে মা মেরির মুখের সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করেছেন, কোথাও কোনো ক্ষতের চিহ্ন নেই। তবে তাঁর সামনে একটি কাচের আবরণ বসেছে, এই যা দুঃখ।

গির্জা থেকে বেরিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে আমরা সিস্টিন চ্যাপেল ও ভাটিকান মিউ-

ভাটিকান লাইব্রেরি

জিয়াম দেখতে গেলাম। সেখানে যে অমূল্য শিল্পসম্ভার আছে তার কোন্‌টি ছেড়ে কোন্‌টির কথা বলি? কীভাবে তাদের সৌন্দর্য বোঝাই তোমাদের? সিস্টিন চ্যাপেলের ভিতরকার ছাদে আছে তরুণ মিকেলেঞ্জেলোর সেই সব দুর্ধর্ষ ছবি — 'আলো ও অন্ধকারের বিভাজন', 'সূর্যচন্দ্রের সৃষ্টি', 'মানুষের সৃষ্টি', 'ইভের সৃষ্টি'। আরেকদিকে দ্যাখো বতিচেল্লির মোজেস আর খ্রীষ্টের ছবি! ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে তুমি এমন করে পৃথিবীর নাগরিক হয়ে যাও যেখানে চন্দ্রসূর্যতারা, মহৎ সন্ত আর দেবদেবীদের বিরাট অস্তিত্বের অংশ হয়ে যাও তুমি। ওদিকে দ্যাখো মিকেলেঞ্জেলোর 'শেষ বিচার', দ্যাখো অন্য ঘরে গিয়ে জগৎবরেণ্য রাফায়েলের 'ফোলিনিয়োর মাদোন্না'। মিউজিয়ামে গিয়ে দ্যাখো গ্রীক দেবতা নিরুপম অ্যাপোলোর মূর্তি, কিংবা 'লাওকুউন' নামে সেই ভয়ংকর জীবন্ত ভাস্কর্য—যেখানে অ্যাপোলোর পুরোহিত লাওকুউন আর তার দুই ছেলেকে দুটি প্রকাণ্ড সাপ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। তাঁর অপরাধ কী শুনবে? না তিনি ট্রয়বাসীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, খবরদার, গ্রীকরা যদি মস্ত একটা কাঠের ঘোড়া নিয়ে আসে—কিছুতেই তাকে ঢুকতে দেবে না ট্রয়ের চৌহদ্দির ভেতরে! এতেই চটে গিয়েছিলেন দেবী এথেনা—তিনিই সাপ দুটোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন লাওকুউনকে শাস্তি দেবার জন্য। লাওকুউনের সাবধানবাণী যে ব্যর্থ হয়েছিল সেও তো তোমরা জানো।

মিউজিয়াম দেখে নামছি, হঠাৎ সঙ্গের শিশুটি জানলার ধারে ছুটে গিয়ে তার মা-বাবাকে 'দেখে যাও' বলে ডাকতে লাগল। গিয়ে দেখি নীচের বাগানে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে এক অপরূপ মূর্তি—ভাটিকানের সুইৎসারল্যান্ডদেশীয় প্রহরীদের একজন।

ফেরার সময় সেই ভারতীয় সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, "কী, সব দেখা হল?" বললাম, "কিছুই দেখা হল না, কিন্তু যেটুকু দেখলাম তাতেই আয়ুর বাকি সময়টুকু দিব্যি কেটে যাবে।"

ও'রা হেসে বললেন, "তা ঠিক।"

ঘণ্টাকর্ণের কান গেল

মনোজ বসু

॥ ২ ॥

খুলে গেল দরজা। এখানেও মেয়ে—মাঝ-বয়সি একজন, হাসি-হাসি মুখ। পাখি ধরার ব্যবসা এদের, উঠোনে পা দিয়েই মালুম হয়। মেলা খাঁচা ঝুলছে এদিকে-সেদিকে, খাঁচার ভিতর রঙ-বেরঙের পাখি। গুলতি তীরধনু সাতনলা—পাখি ধরার নানান সরঞ্জাম। সূক্ষ্ম সুতোর জাল বিছানো উঠোনের উপর— এত সূক্ষ্ম যে পাখির নজরেই পড়ে না, আধার খেতে বসে জালের সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

অর্জুনকে ভূতানন্দ বিড়বিড় করে বলে, "অত সরু সুতো, কিন্তু বিশ মন পাথর ঝুলিয়ে দিলেও ছিঁড়ে পড়বে না।'

মেয়েটা একগাল হেসে শুধায়, "বলুন কী আদেশ।"

ভূতানন্দ বলে, "হীরামন তোতা চাই। মনিব আমাদের ভারী শৌখিন—তাঁর ফরমাস। আছে তোমাদের কাছে?"

"আছে বইকী। এখানে না থাকলে দুনিয়ার কোথাও থাকবে না।"

মেয়ে ঘাড় তুলে তীক্ষ্ম চোখে ভূতানন্দের আপাদ-মস্তক দেখে নিল একবার। বলে, "হীরামন কি বাইরে রাখার জিনিস? কুঠুরির ভিতর আছে, ঢুকে গিয়ে দেখ। ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে পাখির কথা শোনো গে। হীরামনের নাচ দেখিয়ে দেব এর পর, গানও শোনাব দাম কিন্তু অনেক পড়বে।"

ভূতানন্দ বলল, "মনিব-মশায় মস্ত বড় ধনী। আসল হীরামন হলে দামের জন্য আটকাবে না।"

কথা বলতে বলতে ছোট্ট এক কুটিরের সামনে এসে গেছে তারা। মেয়েটা দেখায়, "পাখি ওই ভিতরে।"

বলার শুধু অপেক্ষা—ভূতানন্দের ইশারা পেয়ে অর্জুন প্রচণ্ড ধাক্কা দিল পিঠে. চৌকাঠ গলে হুমড়ি খেয়ে মেয়ে ভিতরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তর—থুনথুনে বুড়ি, সর্বাঙ্গে দগদগে ঘা, মাছি ভনভন করছে ঘায়ের উপর। বীভৎস মুখ, তাকিয়ে দেখা যায় না। চোখের মণি একটা গলে বেরিয়ে এসেছে। বাঁ-হাতেরও আধাআধি পচে গলে খসে পড়ছে।

ভূতানন্দ হি-হি করে হাসে, "চুম্বক-কুঠুরিতে আমাদের ঢোকাচ্ছিলি—যেমন কর্ম তেমনি ফল, নিজেই এবার আটক হয়ে গেলি।"

বুড়ির কান্নাকাটি এখন। "আপনাদের চিনতে পারিনি হুজুর। বাঁ-হাত ধরে কষে একটা হ্যাঁচকা টান দিন, কুঠুরি থেকে বের হয়ে পড়ব।"

"যা বলবি, সমস্ত করব। সুতোর সেতুর বুনন শেষ করে ফেলেছিস—আমরা সকল খবর রাখি। সেতু কোথায় রেখেছিস, বলে দে আগে। কুঠুরি থেকে বেরুনো তার পরে।"

"সেতু বোনা—সে আবার কেমন?" কুটে বুড়ি আকাশ থেকে পড়ে; "পাখি-ধরা জাল বুনেছি—সে ঐ উঠোনের উপর বিছানো। জাল ছাড়া আর আমি কিছু বুনিনে।"

ভূতানন্দ খিঁচিয়ে উঠল, "চালাকি করবি নে কুটেবুড়ি। বুননের তুই বড় ওস্তাদ, ধাড়িবাজিতে আরও বড়। প্রাণের পরোয়া না করে সমস্ত খবর আমি জুটিয়ে ফেলেছি। খাল পারাপারের অসুবিধা বলে ঘণ্টাকর্ণ তোকে সুতোর সেতু বুনতে হুকুম দেয়। সেই সেতু শেষ করেছিস কদিন আগে। মিহি সুতোর এমন খাসা বুনানি—লম্বায় এক-শ হাত, তবু নাকি গুটিয়ে থলির মধ্যে ভরা যায়।"

তবু বুড়ি প্রতিবাদ করে, "মিথ্যে কথা। আপনাদের ঝুটো খবর দিয়েছে।"

রাগ দেখিয়ে ভূতানন্দ বেরিয়ে যাচ্ছে, অর্জুন পিছনে। বলে, "দিসনে সেতু—বয়ে গেল। পার হওয়া আটকে থাকবে নাকি—গাছে চড়ে পার হয়ে যাব। তোর জীবন অন্ধকারেই কাবার হবে, পাকা ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। কুলুপ এঁটে দিয়েছ তো অর্জুন, চাবি নিয়েছ?"

এগিয়েছে কয়েক পা, পিছনের ব্যাকুল ডাক আসে—"ফিরে আসুন, রাগ করে যাবেন না। দেয়ালের গায়ে থলিতেই ঝোলানো আছে, নিয়ে নিন গে। ধর্ম রাখবেন কিন্তু, কুঠুরির দ্বার করে দিয়ে যাবেন।" .

সেতুর থলি অর্জুন বগলদাবায় নিয়ে নিল। ভূতানন্দ তাড়াতাড়ি বেরুচ্ছে—হেঁটে নয়, উড়ে চলেছে সে যেন। অর্জুন প্রশ্ন করে—"কুটেবুড়িও আটক থাকবে?"

"ওকে আটকানোর জন্যেই তো এ-বাড়িতে ঢোকা। ঘণ্টাকর্ণের দু-নম্বুরি ডাকিনী—জটেবুড়ির নজর ফসকে কেউ যদি এদ্দুর এসে গেল, কুটেবুড়ি তাকে ধরে ফেলবে। সুতোর সেতু আমাদের উপরি লাভ—সেতু খাটিয়ে চট করে খাল পার হয়ে যাব। নয়তো ঝঞ্ঝাট ছিল অনেক, বিপদের ভয়ও ছিল।"

আবার কিছুদূর গিয়ে টুপির দোকান। দরজার পাশে বসে ওস্তাগর টুপি সেলাই করে, খদ্দের এলে ঘুরে ঘুরে টুপি দেখায়। ভূতানন্দ ও অর্জুন ঢুকে পড়ল। নানা রঙের নানা সাইজের রকমারি টুপি—ভূতানন্দের একটাও তবু পছন্দ হয় না। বলে, "ধুলোয় আর রোদ্দুরে মাল সব লাট হয়ে গেছে। গেল-বছর নিয়েছিলাম, তেমনধারা জিনিস দেখছি নে। সে টুপি তুমি পিছনের ঘর থেকে বেছে-গুছে এনে দিয়েছিলে।"

ওস্তাগর বলল, "পিছনের ঘর থেকে এবারও নিয়ে আসছি। খদ্দের ফিরতে দেব না।"

পিছনের ঘরে গেল। যে-ই না গিয়েছে—আগে থেকে অর্জুনকে তালিম দেওয়া আছে দস্তুর-মতো—চৌকির নীচে থেকে পুরনো ময়লা শতচ্ছিন্ন এক টুপি তুলে নিয়ে দে ছুট। ভূতানন্দও পিছনে রয়েছে। আশ্চর্য টুপি—মাথায় পরলে সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য, জলজ্যান্ত একটা মানুষ ঘুরছে ঘুণাক্ষরে কেউ বুঝবে না।

অর্জুন বলল, "এক টুপিতে তোমার আমার দুজনের কী করে হবে?"

ভূতানন্দ বলে, "তোমার হলেই হবে। আমার মাথায় টুপি লাগে না, মন্তোরে বাতাস হয়ে যাই। কড়ুই পালোয়ানের মড়া ঝুলছিল, আমি তো সেখানেই। দেখতে পেয়েছিলে আমায়? বলো।"

অনতিদূরে খাল। চওড়া সামান্য, কিন্তু স্রোত করাল। কুটোগাছটি পড়লে দু-খণ্ড হয়ে যায়। পারাপারে বিপদের শঙ্কা। ডালপালা-মেলানো গাছ আছে খালের এপারে, এবং ওপারেও। গাছে চড়ে লোকে খালের উপর ডালের শেষ প্রান্ত অবধি চলে যায়, সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ওপারের গাছে। পা ফসকালেই প্রাণ যাবে, গিয়েছেও অনেক প্রাণ এতাবৎ। ভূতানন্দের বন্দোবস্তের গুণে এরা একেবারে নির্বিঘ্ন—ঘণ্টাকর্ণের ফরমায়েসি সেতু অর্জুনের বগলদাবায়।

সেতুর এক মাথা গাছের সঙ্গে বাঁধল, ও-মাথায় একটা পাথর বেঁধে ছুঁড়ে দিল

আজকের এই কর্মব্যস্ত জীবনে নিজেকে পুরোপুরি চাঙ্গা রাখতে যে বাড়তি স্ট্যামিনার দরকার, তা শুধু ভিভা'ই আপনাকে দিন-রাত-ভর যোগাতে পারে।

ভিভা দিন-ভর দারুণ স্ট্যামিনা যোগায়!

ভিভা প্রস্তুতের আধুনিক প্রক্রিয়ায় রয়েছে আরও বেশী শক্তি-দায়ক মল্ট এবং টিস্যু গড়ে তোলার জন্য আরও প্রোটিন। যার ফলে, বাড়তি স্ট্যামিনা যোগানের দরুন আপনি চাঙ্গা দেহে স্ফূর্তির সঙ্গে কাজ-কর্ম, খেলাধুলা করতে পারেন।

রাতে আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করে—ভিভা!

রাতে শোবার সময় এক কাপ গরম সুস্বাদু ভিভা, আপনাকে ঘুমের সঠিক ছন্দে এনে দিয়ে পুরোপুরি বিশ্রামের সুযোগ দেয় এবং সেইসঙ্গে পুষ্টিও যোগায়। ফলে, ভোরবেলা আপনি জেগে ওঠেন নতুন শক্তি নিয়ে। মনে রাখবেন, ভিভার আনন্দ ছাড়া জীবনটাই নিরানন্দ!

ভিভা'র বেশী দাম উসুল!

অন্যান্য খাদ্যপ্রাণ পানীয়ের তুলনায় এক বোতল ভিভায় আপনি বেশী কাপ সুস্বাদু পানীয় পান।

৫০০ গ্রামের দাম মাত্র **১১ টাকা ১৪ পয়সা**
(স্থানীয় কর আলাদা)

JiL জগৎজিত ইণ্ডাস্ট্রীজ্ লিমিটেড

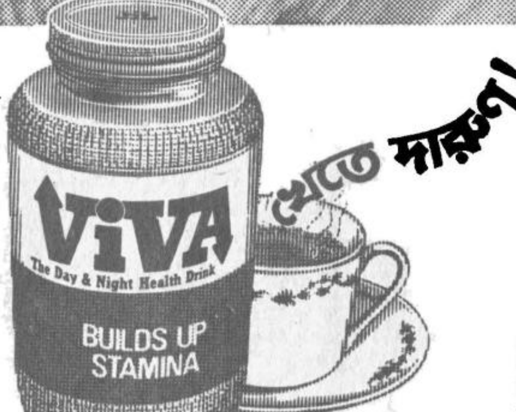

ASP/JIL-3-79 BEN

অর্জুন ওপারে। তাক অব্যর্থ, ঠিক লক্ষ্যস্থানে গিয়ে পড়েছে—এদিকে-ওদিকে সামান্য টানতেই খটাস করে পাহাড়ের খাঁজে পড়ে গেল। হাত-খানেক মাত্র চওড়া সেতু—ভূতানন্দ তার উপর দিয়ে অবলীলাক্রমে পার হয়ে গেল। একটুও টলল না—কলকাতার কোনো মসৃণ পিচের রাস্তায় চলে গেল যেন। অর্জুন কিন্তু টাল-মাটাল খাচ্ছে খুব। তার মধ্যে হঠাৎ ভূতানন্দ ব্যস্তসমস্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "চলে এসো শিগগির—খুব শিগগির—লাফ দিয়ে পড়ো ডাঙায়।"

অর্জুন লাফিয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখে, ওস্তাগর দল জুটিয়ে পিছনে ধাওয়া করেছে। তাগড়া তাগড়া জওয়ান, হাতে চকচকে খোলা তলোয়ার—সেতুর মাঝামাঝি তারা এসে গেছে। ভূতানন্দ চেঁচাচ্ছে, "সেতু কেটে দাও।" খাণ্ডা ছোঁয়াতেই সেতু দুই খণ্ড—ওস্তাগর দলসুদ্ধ ঝপাঝপ খালে পড়ে ভেসে গেল। আপদের শান্তি।

সামনে দেখা যায় ঘণ্টাকর্ণের ডেরা। আসল কাজ—এইবার—ঘণ্টাকর্ণের কান কাটা। ভূতানন্দ বলে দেয়, "মাথায় টুপি এঁটে চলে যাও এইবার, কানজোড়া টুক করে কেটে নিয়ে ফিরে এসো। এই লতাপাতার উপর ততক্ষণ একটু গড়িয়ে নিই। আমাকে এখানেই পাবে।"

বলতে বলতে ভূতানন্দ আর নেই। বাতাস হয়ে গেছে নাকি? টুপির গুণে অর্জুনও অদৃশ্য। গোড়ায় সেটা মালুম হয়নি তার। কিন্তু ঘণ্টাকর্ণের সাঙ্গোপাঙ্গরা কাজেকর্মে ঘোরাফেরা করছে—অর্জুন সামনের উপর, তার দিকে কেউ তাকিয়েও দেখে না—অবস্থা বোধ-গম্য হল তখন।

তবে আর ভাবনাটা কী? ঘণ্টাকর্ণ খেতে বসেছে, অর্জুন কাছে গিয়ে কানে তাক করছে। গণ্ডারের চামড়ার চেয়েও শক্ত চামড়ার কান, হাতির কানের চেয়েও আয়তনে বড়। এহেন বস্তু খাণ্ডার স্পর্শমাত্রেই টুকটুক করে খসে পড়ল। হুঙ্কার তুলেছিল ঘণ্টাকর্ণ, কণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে গেল। মুহূর্তে রূপান্তর—কর্ণ-হীন ঘণ্টা হাত-পা গুটিয়ে পিণ্ডাকার হয়ে পড়ল। কানদুটোর পাতাতেই ঘণ্টার যাবতীয় দাপট—সে কান গেল তো সর্বস্ব গেল। এখন থেকে মেনি বিড়ালের মতো মিউ-মিউ করে বেড়াবে সে।

কাটা কান দুটো কাঁধে তুলে নিয়ে বিজয়ী অর্জুন গটমট করে যাচ্ছে। খালের ধারে এসে টুপি খুলে আবার আপন মূর্তিতে ফিরল। "ভূতো-দা"—ডাকতে না-ডাকতেই দেখা যায় ভূতানন্দ পাশটিতে দাঁড়িয়ে হাসছে। বলে, "বাহাদুর বটে অর্জুন! মুখে মুখে যা বলে দিয়েছি—ভুল করোনি, ভয় পেয়ে যাওনি—নিখুঁতভাবে হাসিল করে এলে। যেমনটা তুমি চেয়েছিলে—একলা হাতেই সব করেছ, আমি হাত ঠেকাইনি।"

পরক্ষণে বলে, "হাত ঠেকানোর উপায়ও নেই আমার ভাই।"

"কেন? কেন?"

"হাত-ই নেই যে। থাকলে বাহবা বাহবা বলে নিশ্চয় তোমার পিঠ চাপড়ে দিতাম। ইচ্ছে হচ্ছে খুব, কিন্তু নিরুপায়।"

কণ্ঠস্বর কেমন ভারী হয়ে এল। বলে, "পা-ও নেই। এত যে হাঁটা-চলা করি—পায়ের হাঁটা নয়, মাটির গা ঘেঁসে ভেসে ভেসে বেড়ানো। গায়ে হাত দাও আমার, বুঝতে পারবে।"

অবাক কাণ্ড। চামড়া-হাড়-মাংস নেই, কঠিন বস্তু কিছুই নেই—নরমূর্তিতে খানিকটা ধোঁয়া। ধোঁয়া মূর্তি ধরে বেড়াচ্ছে; কথা বলছে—

স্তম্ভিত অর্জুন বলে, "কে তুমি ভূতো-দা? সত্যি কথা বলো।"

ভূতানন্দ—"বলেছি তো আগে।"

"মানুষ নও?"

"ছিলাম সেদিন অবধি। —পালোয়ান আনন্দ কড়ুই। মরে ভূত হয়ে গিয়ে আনন্দ কড়ুই আজ ভূতানন্দ।"

সাধারণ পরিষ্কার করার পাউডার ব্যবহার করার পর
কিছু অবশিষ্ট গুঁড়ো থেকে যাওয়া সম্ভব

ভিম আনে নিখুঁত ঝলমলে চমক !

এর মধ্যে আছে দেড়গুণ পরিষ্কার করার ক্ষমতা

ভিমে আছে পরিষ্কার করার যে কোনো পাউডারের চেয়ে বেশী ডিটারজেন্ট। তাই এর বাড়তি পরিষ্কার করার ক্ষমতা—তেলাভাব আর সমস্ত দাগ নিমেষে সাফ করে দেয়, কোনো গুঁড়ো অবশিষ্ট রাখে না। তা ছাড়া **ভিম** অতি-মিহি ও মোলায়েম হওয়ার ফলে পরিষ্কারও ভালো হয় অথচ আঁচড় পড়ে না। **ভিম** ব্যবহারে সব কিছু ঝলমলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

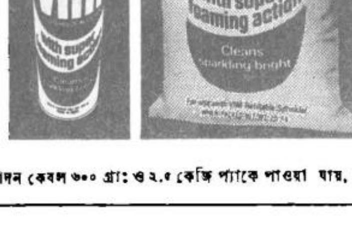

আপনার ২০% দাম বাঁচবে এই প্যাক কিনলে

হিন্দুস্থান লিভারের এই উৎকৃষ্ট উৎপাদন কেবল ৬০০ গ্রা: ও ২.৫ কেজি প্যাকে পাওয়া যায়, কখনও খোলা বিক্রী হয় না।

লিনটাস-V.56-2115 BG

কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে : জয়রামবাবুর মাতৃহারা ছেলে জ্যোতি নিরুদ্দেশ। চন্দ্রভানু চুরি করেছেন তাকে। জ্যোতিকে নিয়ে ট্রেনযাত্রায় মধ্যরাত্রে দুর্ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরে চন্দ্রভানুর। এদিকে পুলিসের হাতে আটক বেহুঁশ ছেলেটিকেই জ্যোতি ভেবে গ্রহণ করেছেন জয়রামবাবু, ওদিকে আসল জ্যোতি হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে। দুর্ঘটনার আগের কোনও কিছুই তার মনে পড়ে না। তারপর—

॥ ৯ ॥

তখন সবে ভোর হয়েছে। রোগীরা সবাই তখনও বিছানা থেকে ওঠেনি। সিস্টার তাড়াতাড়ি স্টাফ-রুমে গিয়ে হাজির।

বললে, "ঝর্নাদি, বারো নম্বর ঘরের রোগী কোথায় গেল? তাকে তো কোথাও পাচ্ছি না।"

ঝর্না বললে, "কোথায় আবার যাবে। নিশ্চয় কোথাও আছে।"

সিস্টার বললে, "না, কোথাও তো তাকে পেলুম না। বাথরুমেও নেই। আমি সব জায়গাতেই দেখেছি।"

খবরটা ছড়িয়ে গেল সকালবেলা। হাসপাতালময় হৈ-চৈ পড়ে গেল। কিন্তু হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টের কাছেও খবরটা পৌঁছে গেল। তিনি অন্যদিনের চেয়ে একটু আগে এসে অফিসে পৌঁছলেন। বলে দিলেন—খবরটা যেন চাপা থাকে, কেউ যেন প্রকাশ না করে দেয়। নইলে খবরের কাগজে একবার খবরটা ফাঁস হয়ে গেলে তখন অনেকের চাকরি চলে যাবে—

দেবরাজ চৌবেজিকে সবাই চৌবেজি বলেই ডাকে। উত্তরপ্রদেশের কোন-এক গ্রাম থেকে একদিন এখানে এসেছিল। এই চান্দৌলি গ্রামে। এসে একটা লোহা-লক্কড়ের দোকানে কাজ নিয়েছিল। মাসকাবারি মাইনে ছিল তিন টাকা। আর খাওয়া-পরা-থাকা সব দিত মালিক। তার জন্যে তাকে পয়সা দিতে হত না। তারপর যখন ব্যবসা সম্বন্ধে একটু জ্ঞান হল তখন হাতে কিছু টাকা হল। তখন সেই টাকা দিয়ে একটা মুদিখানার দোকান করে বসল চৌবেজি। তখন তার বেশ বয়েস হয়েছে। ব্যবহারটাও বরাবরই ছিল মিষ্টি। লোহা-লক্কড়ের দোকানের মালিকও জেনে খুশি হল খুব। কত বছর চাকরি করেছে তার দোকানে। কখনও আধলাও সরায়নি সে। তাই দোকান করবার সময় মালিক নিজের পকেট থেকেও কিছু টাকা দিলে।

তারপর সেই দোকান ক্রমে বড় হল। তার মিষ্টি ব্যবহারে খদ্দেররাও তারই দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনতে লাগল। পৃথিবীতে যারা ভাল লোক সবাই-ই তাদের ভালবাসে। তাদের প্রথম-প্রথম একটু কষ্ট ভোগ করতে হলেও শেষ পর্যন্ত তাদেরই জয় হয়। চৌবেজিরও তাই হল। চান্দৌলি গ্রামের সবাই-ই চৌবেজির দোকান থেকে তাদের সংসারের রোজকার জিনিসপত্র কিনতে লাগল। তারা বলতে লাগল, "চৌবেজির দোকানে সব জিনিসই সস্তা।"

খবরটা রটতে রটতে জমিদারবাবুর কানেও পৌঁছুল। সূর্যনারায়ণবাবু নিজে পায়ে হেঁটে রোজ গঙ্গাস্নান করতে আসতেন। ফেরার পথে চৌবেজির দোকানের সামনে আসতেই চৌবেজি তাঁকে দেখে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত।

সূর্যনারায়ণবাবুও চৌবেজিকে প্রণাম করতেন। একটা দুটো কথাও হত। ব্যবসা কী রকম চলছে, এই সব তুচ্ছ কথা।

উত্তরে চৌবেজি বলত, "আপনার দয়ায় ভালই চলছে হুজুর।"

একদিন সূর্যনারায়ণবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা চৌবেজি, তুমি আমাকে রোজ প্রণাম করো কেন বলো তো? আর কেউ তো আমায় রোজ প্রণাম করে না।"

চৌবেজি বললে, "সকালবেলা আপনাকে প্রণাম করলে দেখেছি আমার দিনটা ভাল যায় হুজুর।"

এর পর থেকেই জমিদারবাবুর বাড়ির জিনিসপত্র সব চৌবেজির দোকান থেকেই কেনবার হুকুম হয়ে গেল। তখন থেকে চৌবেজির দোকান আরো ফুলে-ফেঁপে

উঠল। একলা চৌবেজির দ্বারা সব কাজ করা আর সম্ভব হল না। ততদিনে একটা ছেলে হয়েছিল চৌবেজির। সেই ছেলে ছোটবেলা থেকেই বাপের দোকানে বসতে লাগল। বাচ্চা ছেলে। কিন্তু বাপের সঙ্গে দোকানে বসে বসে সব শিখে নিয়েছিল সে। কী-রকম করে দাঁড়িপাল্লা ধরতে হয়, খদ্দেরদের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয়, তাও জেনে গিয়েছিল। আগে চৌবেজি ছিল একলা, তখন থেকে হল দুজন। একজনের বয়েস হয়েছে, আর একজন ছোট ছেলে।

সূর্যনারায়ণবাবু বললেন, "বাঃ, বেশ ছেলেটি তো তোমার। কী নাম রেখেছ ছেলের?"

চৌবেজি বললে, "বিশ্বনাথ।"

"খুব ভাল নাম রেখেছ তোমার ছেলের।"

চৌবেজি ছেলেকে বললে, "প্রণাম কর হুজুরকে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর।"

বিশ্বনাথ তাই-ই করলে। সূর্যনারায়ণবাবু আশীর্বাদ করলেন। বললেন, "তোমার এ-ছেলে একদিন খুব বড় হবে, দেখে নিও—"

চৌবেজি সূর্যনারায়ণবাবুর পায়ে আবার প্রণাম করে মাথায় হাত ঠেকাল।

বললে, "আপনি আশীর্বাদ করুন, এ-ছেলে যেন বেঁচে থাকে, তার বেশি আমি আর কিছু চাই না।"

কিন্তু দু বছর পরেই একটা দুর্ঘটনা ঘটল। তখন 'চূড়ামণি-যোগ' হয়েছে। আশে-পাশের গ্রাম থেকে প্রচুর ভক্তিমান লোক এসেছে গঙ্গায় স্নান করতে। অন্য অনেক দেশ থেকেও লোক এসেছে গঙ্গায় স্নান করতে। চূড়ামণি-যোগে গঙ্গায় স্নান করলে পরলোকে অক্ষয় স্বর্গবাস হয়, সকলেরই এই ধারণা। যেদিন যোগ হবে তার একমাস আগে থেকেই চান্দোলি গ্রাম লোকে লোকারণ্য। শেষকালে আর কারও থাকবার জায়গা জোটে না। তখন খোলা মাঠের ওপর চাটাই ঢেকে সবাই থাকতে লাগল। চৌবেজির দোকান থেকেই সবাই চাল-ডাল-তেল-নুন কিনতে লাগল। যত মাল চৌবেজি কিনে আনে, সব বিক্রি হয়ে যায় রাতারাতি। সাধু-সন্ন্যাসীতে ভরে গেল দেশ। কোথা থেকে ভিখিরির দলও এল ভিক্ষে করতে।

'যোগের দিন' চৌবেজি বউ-ছেলে সঙ্গে নিয়ে রাত তিনটের সময় উঠে গঙ্গায় স্নান করতে গেল। স্নান করে ফিরে এসে আবার ভোরবেলাই দোকান খুলতে হবে। কিন্তু ততক্ষণে গঙ্গার ঘাটে মানুষের ভিড়ে একতিল দাঁড়াবার জায়গা নেই। চৌবেজি কোনওরকমে স্নান সেরে নিয়ে যখন ওপরে উঠল তখন হঠাৎ খেয়াল হল বিশ্বনাথ নেই। খুব খোঁজাখুঁজি করলে চৌবেজি। কোথাও নেই সে। কোথায় গেল সে? গেল কোথায় বিশ্বনাথ?

এ-সব অনেকদিন আগের ঘটনা। শেষ পর্যন্ত বিশ্বনাথকে আর পাওয়া যায়নি!

সূর্যনারায়ণবাবু অনেক দিন অসুখে ভুগ-ছিলেন। অতদিন আগে যে চূড়ামণি-যোগ গেল তাতেও তিনি গঙ্গাস্নান করতে পারেননি। তারপর ডাক্তারের পরামর্শে তিনি স্বাস্থ্য সারাতে মধুপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে এক বছর কাটিয়ে যখন তিনি চান্দোলিতে ফিরলেন তখন আবার গঙ্গাস্নান আরম্ভ করলেন।

ফেরবার পথে চৌবেজি তাঁকে দেখেই বললে, "প্রণাম হুজুর।"

সূর্যনারায়ণবাবুর হঠাৎ নজর পড়ল বিশ্ব-নাথের দিকে।

জিজ্ঞেস করলেন, "এ কী, তোমার ছেলে ফিরে এল নাকি? কোথায় ছিল এ এতদিন? এ কী-রকম চেহারা হয়ে গেছে?"

চৌবেজি বললে, "না হুজুর, এ আমার বিশ্বনাথ নয়, এ অন্য একজন।"

সূর্যনারায়ণবাবু অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ছেলে নয় তো কে এ?"

চৌবেজি বললে, "তা জানি না হুজুর। এর নাম কী, কোথা থেকে এসেছে, এর বাপ-মা কে, তাও এ বলতে পারে না।"

"তার মানে? কোথা থেকে তুমি পেলে একে?"

চৌবেজি বললে, "একদিন ভোরবেলা দোকানের ঝাঁপ খুলতেই দেখি এই ছেলেটা দোকানের সামনের দাওয়ার ওপর ঘুমিয়ে আছে। আমি ওকে ওর নাম-ধাম জিজ্ঞেস করলাম, ও কিছুই বলতে পারলে না। সেইদিন থেকেই ওকে আমি পুষছি। আমার নিজের ছেলে চলে গিয়েছিল বলেই বোধহয় ভগবান ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন আমার সঙ্গে দোকানে বসে ও কাজ করে।

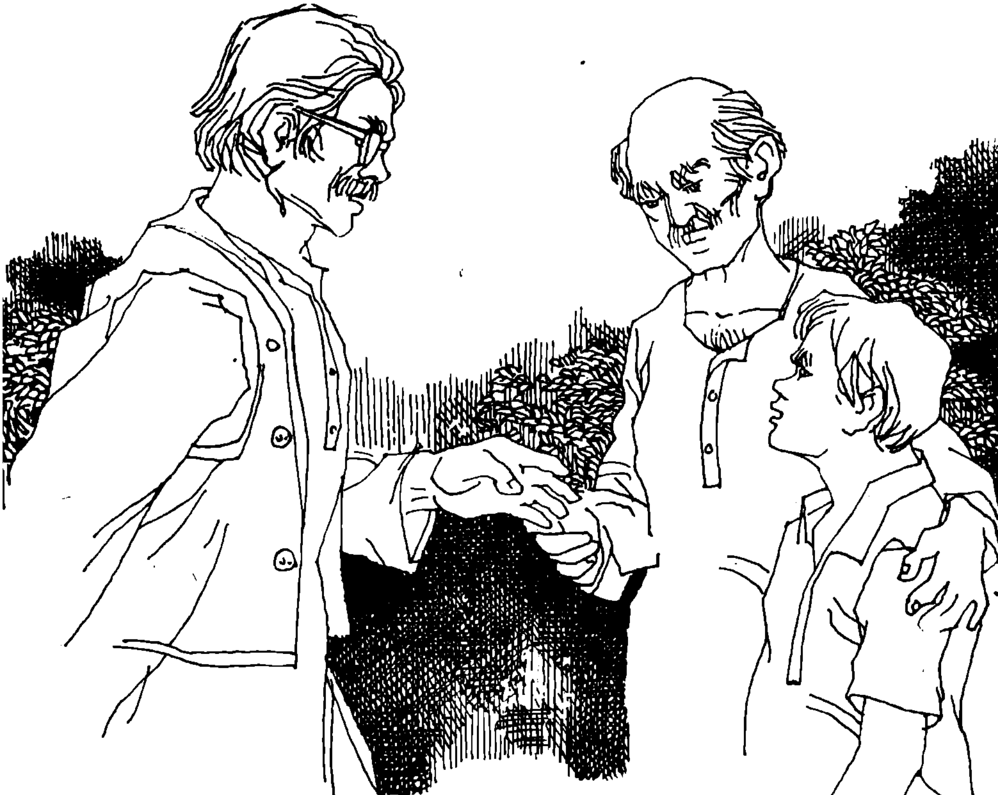

আমার ছেলে যে-কাজ করত এও সেই কাজ করছে। ছেলেটার খুব বুদ্ধি। আমার ছেলের যেমন বুদ্ধি ছিল, এরও ঠিক তেমনি বুদ্ধি হুজুর। এখানকার খদ্দেররা এর ওপরে খুব খুশি।"

সূর্যনারায়ণবাবু ছেলেটিকে আদর করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী বাবা?"

ছেলেটি বললে, "খোকা।"

"খোকা তো ডাক-নাম। তোমার ভাল নাম কী?"

ছেলেটি বললে, "জানি না।"

"তোমার বাড়ি কোথায়? দেশ?"

ছেলেটি আবার বললে, "জানি না।"

"তোমার বাবা মা ভাই বোন কেউ আছে?"

ছেলেটি সেই একই জবাব দিলে। বললে, "জানি না।"

"তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

ছেলেটি এবার বললে, "হাসপাতাল থেকে।"

"হাসপাতাল? হাসপাতালে তুমি কী করতে?"

ছেলেটি বললে, "আমি হাসপাতালে শুয়ে থাকতুম।"

"তা সেখান থেকে চলে এলে কেন?"

ছেলেটি বললে, "তারা আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল।"

"কেন তোমাকে পুলিসে ধরিয়ে দেবে বলেছিল? তুমি কী দোষ করেছিলে?"

ছেলেটি বললে, "আমি আমার নিজের নাম বলতে পারিনি বলে।"

সূর্যনারায়ণবাবু বললেন, "হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তুমি কী করলে?"

"আমি পালাতে লাগলুম।"

"পালিয়ে কোথায় যাবে ঠিক করেছিলে কিছু?"

"ঠিক করেছিলুম পালিয়ে অনেক দূরে

চলে যাব।"

"অনেক দূরে? অনেক দূরে মানে?"

ছেলেটা বললে, "আকাশে।"

সূর্যনারায়ণ জবাব শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "আকাশে কি মানুষ যেতে পারে? তাতে তো এরোপ্লেন লাগে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু পাখিরা তো যায়।"

সূর্যনারায়ণ বললেন, "তা আকাশে না গিয়ে তুমি এখানে এই চান্দোলিতে এলে কেন?"

"আমার খুব ঘুম পেয়ে গিয়েছিল যে!"

চৌবেজি এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিল। এবার বললে, "আমাকেও ও এইসব কথা বলেছে। আপনি যা-যা জিজ্ঞেস করলেন আমিও ওই একই কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। আমাকেও ওই একই জবাব দিয়েছিল। তাই আর কী করি ওকে আমার কাছে রেখে দোকানের কাজ শেখাচ্ছি।"

সূর্যনারায়ণবাবু বললেন, "মনে হচ্ছে, ছেলেটা কোনও বড়লোকের বাড়ির ছেলে হবে। খুব বুদ্ধিমান, সাধারণ ছেলের মতন নয়। তুমি ওকে আমার কাছে দেবে? আমি ওকে মনের মতন করে মানুষ করব।"

চৌবেজি বললে, "তা আপনি রাখতে চান রাখুন না।"

সূর্যনারায়ণবাবু বললেন, "আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমাকে আমি পরে খবর দেব।"

বলে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

একটা হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তখন অফিসে হাজারটা কাজে ব্যস্ত। হাজার রকম লোকের হাজার রকম আর্জি। অনেকক্ষণ ধরে একজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন। তিনি এবার সামনে আসতেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কী চাই?"

ভদ্রলোক বললেন, "দেখুন, আমি একটা ব্যাপারে আপনার কাছে খোঁজ-খবর নিতে এসেছি। অনেক দিন আগে বারহাওরা স্টেশনের কাছে একটা ট্রেন অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল আপনার মনে আছে?"

"হ্যাঁ, মনে আছে। তাতে প্রায় তিনশো লোক আহত হয়, নানান লোককে নানান হাসপাতালে ছড়িয়ে ছড়িয়ে রাখা হয়।"

ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, আমিও সেই ট্রেনে ছিলুম। সঙ্গে আমার এক ভাইপো ছিল। আমি অন্য একটা হাসপাতালে শুয়ে ছিলাম। আর আমার ভাইপো বোধহয় অন্য হাসপাতালে ছিল। আমি এখন সেরে উঠেছি। কিন্তু আমার ভাইপোর কোনও সন্ধান পাইনি। আমি সব হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে খবর নিয়েছি। কেউ তার খবর দিতে পারেনি। শেষকালে খবর পেলাম আপনার এই হাসপাতালেও কিছু লোককে রাখা হয়েছিল। তাই শেষবারের মতো আপনাদের এখানে এসেছি। আপনাদের এখানকার সেই রোগীদের কী অবস্থা বলতে পারেন? কেউ কি মারা গিয়েছিল?"

"না, আপনার ভাইপোর নাম কী?"

"জ্যোতিষ্ক। বয়েস ছ-সাত বছর।"

সুপারিনটেনডেণ্ট একটা মোটা রেজিস্টার-খাতা বার করলেন। নামটা খুঁজতে লাগলেন।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নাম কী?"

ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম চন্দ্রভানু চট্টোপাধ্যায়।"

(ক্রমশ)

ছবি অনুপ রায়

ছেলেবেলায় বাংলা ভাষার প্রতি মধুসূদন দত্তের কোন অনুরাগই ছিল না। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। প্রথম যৌবনে মাদ্রাজে থাকতে তিনি 'ক্যাপটিভ লেডি' কাব্য লেখেন ইংরেজিতে। বন্ধু গৌরদাস বসাকের অনুরোধে এরই এক কপি কলকাতায় বেথুন সাহেবকে পাঠালেন মধুসূদন। বেথুন গৌরদাসকে লেখেন, ''আপনার বন্ধুকে বলুন মাতৃভাষায় লিখতে, স্বদেশের উপকার হবে।'' এ-পরামর্শে কিন্তু কাজ হল। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে মধুসূদন নানা ভাষা শিখতে লাগলেন। সকাল ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তাঁর রুটিন হল, দু ঘন্টা হীব্রু, চার ঘন্টা স্কুলের মাস্টারি, তিন ঘন্টা ইংরেজি। এরই ফাঁকে কাশীদাসী মহাভারত এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়া। এইভাবে বাংলাকাব্য লিখবার জন্যে তৈরি হলেন মধুসূদন। আর প্রথম কাব্যনাট্য 'শর্মিষ্ঠা' লিখে চমকে দিলেন সবাইকে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়: সদাশিব আদিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

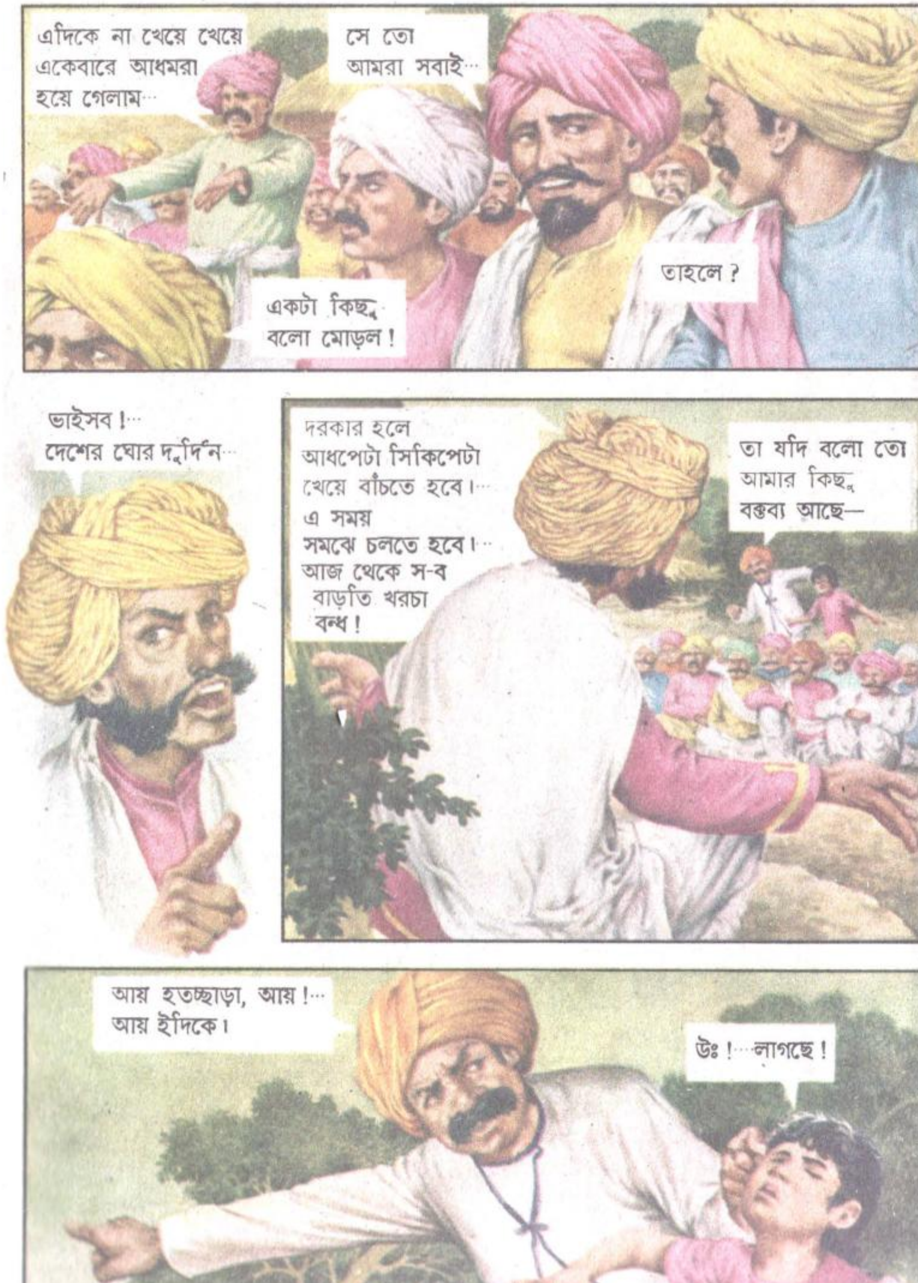

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
কী হল ?
আমাদের দেওয়া গোলের ছবি দেখাবি না ?
ইস্টগেটের সমর্থকরা রেগে গেছে !
এ যে হিতে বিপরীত হল !
হঠাৎ...
আমাদের দোকানের নাম ইয়ং হো... খেলা শেষ হবার পরে এই দোকানের আলুভাজা খেয়ে যাবেন....
কী ?
যাচ্চলে !
আবার বলছি... দোকানের নাম....
খেলার বদলে বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছ ! তাও আলুভাজার !
হাহাহাহা !
ব্যাপার কী রয় ?
বিরতির সময় বিজ্ঞাপন দেখাবার কথা ! আবার ভুল করেছে ! যাক, দর্শকরা অখুশি নয় ?
আমি অখুশি ! এরকম হলে টিভি বন্ধ করে দিতে বলব !
আমি দুঃখিত !
কিন্তু দর্শকরা সত্যিই হাসছে !
হাহা ! হাহাহাহা !
তাই তো !
যাক, আলুভাজাই এযাত্রা বাঁচিয়ে দিল !

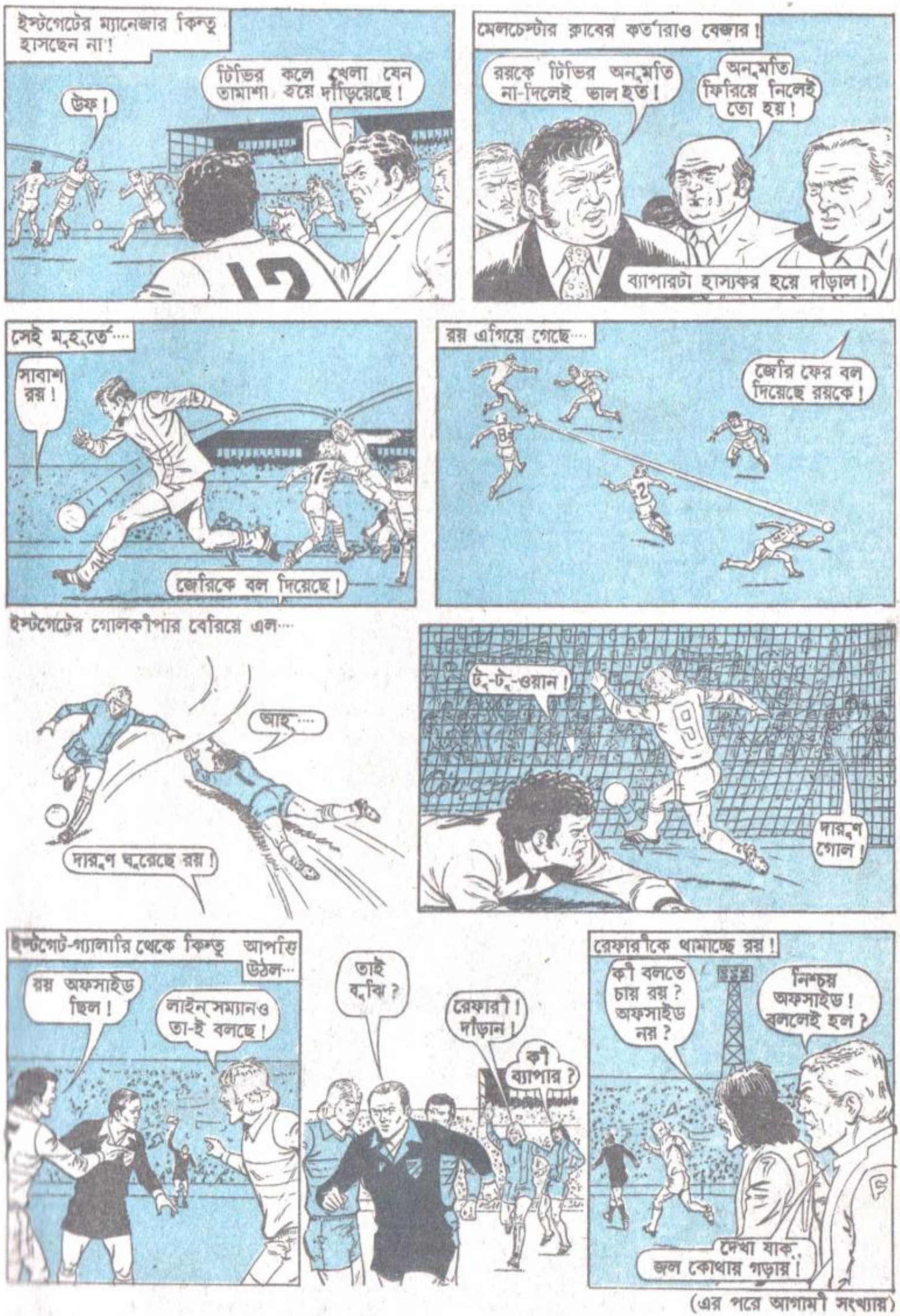

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গেল কোথায় গাড়িটা ?
চারদিকে তল্লাসি চালাও !
ক্যালকুলাসকে চুরি করল কেন ? ক্যালকুলাসই বা মরতে বাগানে গিয়েছিল কেন ?
বোধহয় সন্ধান পেয়েছে !
আপনাদের সামনে দিয়ে কালো গাড়িটা যায়নি ? কিন্তু আমাদের নিষেধ না-মেনে এইদিকেই তো এল !
!
গেল কোথায় তাহলে ? সামনের ওই লোকটাকে জিজ্ঞেস করি।
কালো গাড়ি ? সামনের ওই জঙ্গলেই তো খানিক আগে একটা কালো গাড়ি ঢুকেছে !
ধন্যবাদ।
!
রিরিরিরিং····
রিরিরিরিং····
গাড়িটা পেয়েছ ? ····কী বললে ? ····অ্যাঁ, খালি ?
চলো ! গাড়িটাকে দেখা দরকার !
লোকগুলোকে পেলে মাথা ফাটিয়ে দেব !
খালি গাড়িটা এইখানে পড়ে ছিল ?
হ্যাঁ, কিন্তু লোকগুলো পালাবে কোথায় ? গোটা এলাকাটাই তো ঘেরাও করে রেখেছি !

• (এর পরে আগামী সংখ্যায়)

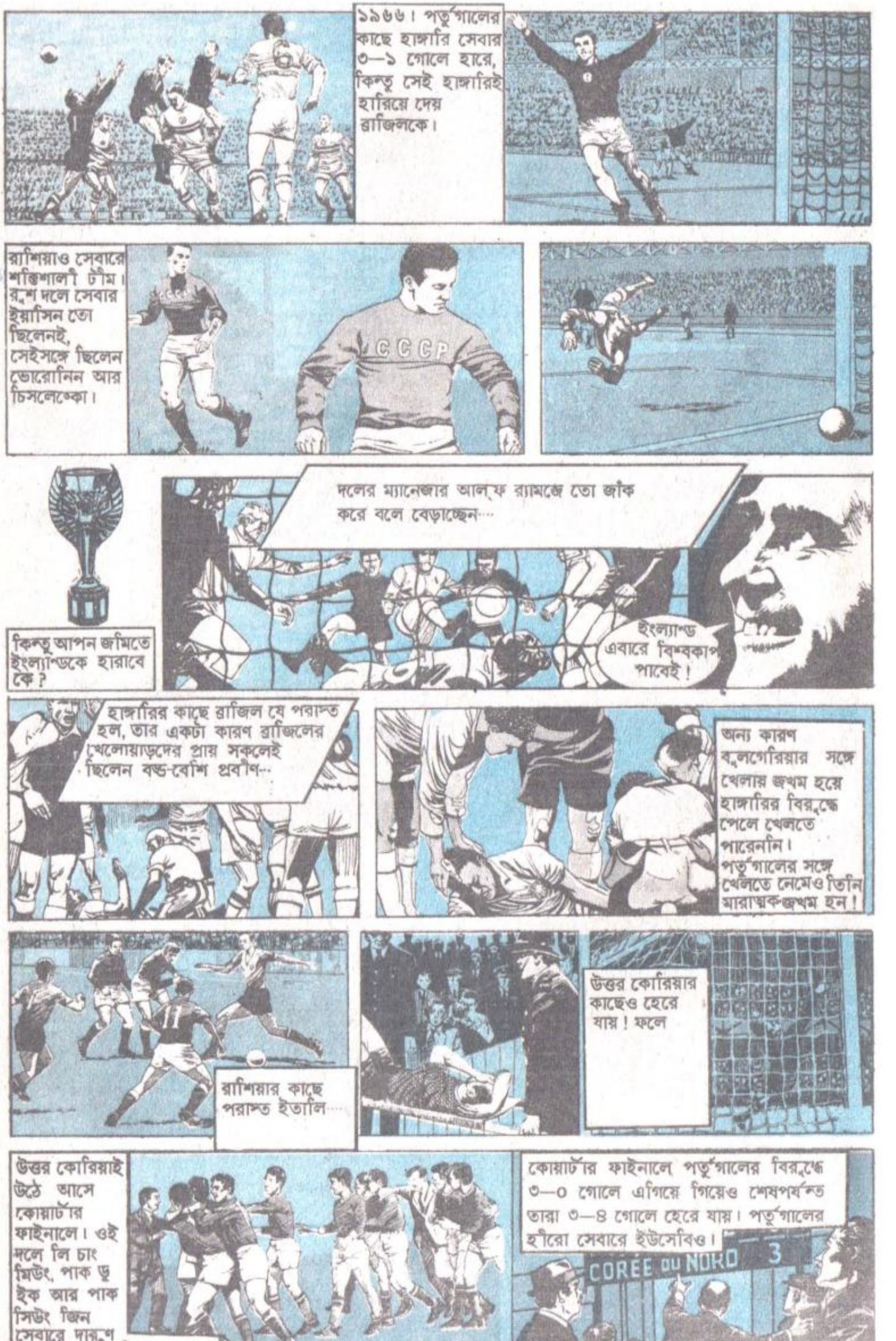
১৯৬৬। পর্তুগালের কাছে হাঙ্গারি সেবার ৩—১ গোলে হারে, কিন্তু সেই হাঙ্গারিই হারিয়ে দেয় ব্রাজিলকে।
রাশিয়াও সেবারে শক্তিশালী টীম। রুশ দলে সেবার ইয়াসিন তো ছিলেনই, সেইসঙ্গে ছিলেন ভোরোনিন আর চিসলেঙ্কো।
CCCP
দলের ম্যানেজার আল্ফ র‍্যামজে তো জাঁক করে বলে বেড়াচ্ছেন···
ইংল্যান্ড এবারে বিশ্বকাপ পাবেই!
কিন্তু আপন জমিতে ইংল্যান্ডকে হারাবে কে?
হাঙ্গারির কাছে ব্রাজিল যে পরাস্ত হল, তার একটা কারণ ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের প্রায় সকলেই ছিলেন বড্ড-বেশি প্রবীণ···
অন্য কারণ বুলগেরিয়ার সঙ্গে খেলায় জখম হয়ে হাঙ্গারির বিরুদ্ধে পেলে খেলতে পারেননি। পর্তুগালের সঙ্গে খেলতে নেমেও তিনি মারাত্মক জখম হন!
রাশিয়ার কাছে পরাস্ত ইতালি····
উত্তর কোরিয়ার কাছেও হেরে যায়! ফলে
উত্তর কোরিয়াই উঠে আসে কোয়ার্টার ফাইনালে। ওই দলে লি চাং মিউং, পাক ডু ইক আর পাক সিউং জিন সেবারে দারুণ খেলেছিলেন। কিন্তু হায়····
কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তুগালের বিরুদ্ধে ৩—০ গোলে এগিয়ে গিয়েও শেষপর্যন্ত তারা ৩—৪ গোলে হেরে যায়। পর্তুগালের হীরো সেবারে ইউসেবিও।
CORÉE DU NORD 3

তোর কী ?

আশা দেবী

"এই যে দাদা
কাল রাতে কি
ঘরের ভেতর
চোর ঢুকেছে ?
রাতটা ভরে
কাণ্ড সে কী!"

বললে দাদা
চুমরিয়ে গোঁফ ঃ
"চোর ঢুকেছে
বাড়ির ভেতর।
বাড়ি আমার,
চোরও আমার,
পরের কথায়
নাক গলানো!
চোর ঢুকেছে,
ঢুকবে আরও,
নিক্ গিয়ে সব
তোর তাতে কী?

ঘোড়ার ডিম

রবিদাস সাহারায়

জুলি আঁকল বেড়াল-ছানা,
অপু বলল, পাখি।
জুলি রেগে বলল, ধ্যাৎ,
পাখি এমন নাকি ?
সিতু বলল, ছবি দেখে
হচ্ছে অনুমান
এটা হল রামের চেলা
জ্যান্ত হনুমান।
জুলির মা বলেন,
এটা কাঁটাল-চাঁপা ফুল,
জুলির বাবা হেসে বলেন,
চাঁদ ওটা বিলকুল!
দাদু বলেন, ছবি নিয়ে
খাচ্ছে যে হিমসিম,
কী এঁকেছে, জানো ওটা ?
আস্ত ঘোড়ার ডিম!

ছবি দেবাশিস দেব

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

[আগে যা ঘটেছে : সন্তু আর কাকাবাবু এবার অভিযানে এসেছেন হিমালয়ে। গোরখশেপ নামে একটা জায়গায় একটা গম্বুজের মধ্যে ছিলেন কয়েক-দিন, সেখানে চতুর্দিকে শুধু বরফ। একদিন এভারেস্টের দিকে কিছুটা এগোবার পর শেরপা ও মালবাহকরা ইয়েতির মতন কোনো বিশাল প্রাণীকে এক ঝলক দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়। কাকাবাবু আর সন্তু আবার আশ্রয় নিলেন গম্বুজের মধ্যে। তারপর কে যেন গম্বুজের লোহার দরজাটা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে। উদ্ধার পাবার জন্য কাকাবাবু অয়ারলেসে খবর পাঠালেন। একজন নেপালি ও একজন ভারতীয় অফিসার হেলিকপটার নিয়ে এসে দরজা ভেঙে উদ্ধার করলেন কাকাবাবুদের। তখন দেখা গেল গম্বুজের বাইরে একজন চীনে ভদ্রলোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। তারপর—

॥ ১২ ॥

চোখের সামনে একজন মরা মানুষকে দেখে সন্তুর শরীরটা ঘুলিয়ে উঠল। সে মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

চীনা ভদ্রলোকটির গায়ে একটা ভেড়ার চামড়ার কোট। থুতনিতে অল্প-অল্প দাড়ি। চোখ দুটি খোলা। দৃষ্টিতে ভয়ের বদলে যেন খানিকটা বিস্ময়ের ভাব মাখানো।

সন্তু মৃতদেহটির দিকে তাকাতে চায় না, কিন্তু কাকাবাবুদের কথাবার্তা শোনার জন্যও দারুণ কৌতূহল। সে কাকাবাবুর পেছনে গিয়ে বসে পড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "এই চীনা ভদ্র-লোকটি কোথা থেকে এখানে এলেন, তা কিছুই বোঝা গেল না। অথচ আমরা এখানে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে পারি না। অনেক কাজ আছে।"

ভার্মা বললেন, "এই মৃতদেহটি কি এখানেই পড়ে থাকবে ? একে এখানেই কবর দিয়ে দেওয়া হোক। চীনেরা মৃতদেহ পোড়ায় না, কবরই দেয়।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে চটপট বরফ খুঁড়ে ফেলা যাক। সন্তু গাঁইতিটা নিয়ে আয় তো!"

জং বাহাদুর রানা হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, "দাঁড়ান, একটা কথা আছে। এই চীনা ভদ্রলোক একজন বিদেশী, এর গায়ে যে কোটটা আছে, সে-রকম কোট আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। ইনি এখানে কী করে এলেন, তা জানা আমাদের সরকারের কর্তব্য। এঁর মৃত্যুর কারণটা জানা দরকার। এই দেহ পোস্টমর্টেম করতে হবে।"

ভার্মা বললেন, "তার মানে এই দেহটা এখন কাঠমান্ডুতে পাঠাতে হবে?"

রানা বললেন, "হ্যাঁ।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এদিকে কোনো চীনা অভিযাত্রী দল কি এসেছিল শিগগির ?"

ভার্মা বললেন, "না তো!"

রানা বললেন, "এভারেস্টের দিকে একটি চীনা অভিযাত্রী দল গিয়েছিল, বেশ কিছুদিন আগে, আড়াই কিংবা তিন বছর হবে।"

"সে দলের কেউ কি হারিয়ে গিয়েছিল?"

"সে-রকম কিছু শোনা যায়নি। তবে চার নম্বর ক্যাম্পের কাছে দু'জন দুর্ঘ-টনায় মারা গিয়েছিল, একথা জানি। সে জায়গা তো এখান থেকে অনেক দূরে।"

"যদি ধরা যায় সেই দলেরই কেউ হারিয়ে গিয়েছিল কিংবা দুর্ঘটনায় পড়েও কোনোক্রমে বেঁচে গিয়েছিল, তবু তার পক্ষে এখানে একা-একা এতদিন বেঁচে থাকা কী করে সম্ভব?"

"কিংবা হয়তো মৃত্যু হয়েছিল তখনই, বরফের তলায় চাপা পড়ে শরীরটা এরকম অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।"

কাকাবাবু ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "তারপর ইয়েতিরা কাল রাত্রে বরফ খুঁড়ে মৃতদেহটা বার করে আমাদের গম্বুজের বাইরে রেখে গেছে, আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করবার জন্য!"

ভার্মা বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি দেখছি ইয়েতিদের অস্তিত্বে একে-বারেই বিশ্বাস করেন না! অথচ, আপনি নিজেই ইয়েতির দাঁত সঙ্গে করে এনেছেন!"

কাকাবাবু এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন, "হুঁ!"

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "যাই হোক, এবারে যা ব্যবস্থা করার করুন। সময় নষ্ট করে তো লাভ নেই।"

রানা আর ভার্মা দু'জনে ধরাধরি করে মৃতদেহটা তুলল। সন্তুও হাত লাগাল। তারপর ওরা চলে এল হেলিকপটারের কাছে।

কাকাবাবু খানিকটা আফশোষের সুরে বললেন, "মৃতদেহটা তো এই হেলিকপটারেই পাঠাতে হবে। অথচ এখন হেলিকপটারটা আমাদের খুব কাজে লাগত।"

রানা বললেন, "ঘন্টা দু'একের মধ্যেই আবার ফিরে আসতে পারবে। কাঠমান্ডু পর্যন্ত যাবে না, সিয়াংবোচি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেই চলবে। তারপর ওরা ব্যবস্থা করবে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের সঙ্গে খাবার-দাবার কিছু আছে? কাল দুপুর থেকে আমাদের ভাল করে কিছু খাওয়া হয়নি। দেখুন না, এই ছেলেটার মুখ শুকিয়ে গেছে।"

রানা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক খাবার আছে। কিন্তু আমি একটা প্রস্তাব দেব? আমাদেরও আর এখানে থাকবার দরকার কী? আমরা সবাই তো এই হেলিকপটারে ফিরে গেলে পারি।"

কাকাবাবু দারুণ অবাক হয়ে ভুরু তুলে বললেন, "আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন রানাসাহেব?"

রানা হাসতে হাসতে বললেন, "কেন পাগল হবার মতন কী করলুম?

কাকাবাবু বললেন, "একটা কাজ করতে এসেছি, সেটা শেষ না করে ফিরে যাব? তাহলে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন? তা হলে লেখাপড়া শিখেছি কেন? যদি ইচ্ছে হয়, আপনারা চলে যান, আমি থাকব।"

সেই মুহূর্তে কাকাবাবুর জন্য খুব গর্ব হল সন্তুর। সে জানে, তার কাকাবাবু ছাড়া এরকম কথা এত জোর দিয়ে আর কেউ বলতে পারে না।

ভার্মা বললেন, "রানাসাহেব, আপনি মিঃ রায় চৌধুরীকে তো ভাল করে চেনেন না, তাই ওকথা বললেন। উনি কোনো একটা কাজ শুরু করে তার শেষ না দেখে ছাড়েন না। সে কাজ যত বিপজ্জনকই হোক না কেন! দারুণ গোঁয়ার লোক! আন্দামানে জারোয়াদের দ্বীপের কাছাকাছি কোনো মানুষ ভয়ে যায় না। উনি নিজে জোর করে সেখানে নেমেছিলেন!"

রানা বললেন, "কিন্তু উনি কী কাজের জন্য এখানে এসেছেন সেটাই তো আমরা ভাল করে জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "বলছি। আগে খাবার বার করুন।"

হেলিকপটারে একটা ত্রিপল ছিল। সেটাকে ভাঁজ করে পাতা হল বরফের ওপর। তারপর নামানো হল অনেকগুলো সসেজ, হ্যামবার্গার, স্যান্ডউইচ আর দু'টো ফ্লাস্ক-ভর্তি গরম কফি।

সুন্দর রোদ উঠেছে আজ। আকাশ ঝকঝকে নীল। কে বলবে যে কালকেই সারা রাত এখানে তুষারের ঝড় বয়ে গেছে। রোদ্দুরের স্পর্শে দারুণ আরাম লাগছে এখন।

রানা হেলিকপটার-চালককে কয়েকটি নির্দেশ দিলেন। মৃতদেহটি নিয়ে হেলিকপটার উড়ে চলে গেল। তারপর তেরপলের ওপর গোল হয়ে বসে ওরা খাওয়া শুরু করল।

রানা বললেন, "ধরা যাক, এখানে ইয়েটি আছে। কিন্তু সে-জন্য তো পরে আরও অনেক লোকজন নিয়ে ফিরে আসা যায়। আমরা তিনজনে মিলে খোঁজার চেষ্টা করাটা নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে না?"

সন্তু বসে আছে রানার পাশেই। সে মুখ তুলে ওঁর দিকে তাকাল।

রানা সন্তুর ঘাড়ে চাপড় মেরে বললেন, "দুঃখিত, দুঃখিত। তিনজন নয়, চারজন। আমাদের এই কিশোর বন্ধুটিও যথেষ্ট সাহসী। কিন্তু এই চারজনে মিলেই বা কী করব?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার কথা-মতন আমিও বলছি, ধরা যাক, এখানে ইয়েতি আছে। আমি নিজে কয়েকটি অদ্ভুত পায়ের ছাপ দেখেছি, তার ছবিও তুলেছি। আর আমার এই ভাইপো সন্তু শপথ করে বলেছে যে সে ইয়েতির মতন অতিকায় কোনো প্রাণী এক পলকের জন্য দেখেছে। শেরপা আর কুলিরা তো সেই দেখেই ভয়ে পালাল। তা

হলে একটা কিছু আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু...

ভার্মা কাকাবাবুর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, "আচ্ছা, মিঃ রায়চৌধুরী, ঐ শেরপা আর কুলিরাই আপনাদের গম্বুজের মধ্যে আটকে রেখে দরজা ঐ রকম ভাবে বন্ধ করে দিয়ে যায়নি তো?"

সন্তু বলল, "না, তা হতে পারে না।"

কাকাবাবু বললেন, "শেরপা আর কুলিরা অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছিল।"

"যদি তারা আবার ফিরে আসে। আসতেও তো পারে!"

"কিন্তু আমাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করে ওদের কী লাভ?"

"লাভ নিশ্চয়ই আছে। আপনাদের ফেলে রেখে ওরা পালিয়েছে, সে-জন্য নেপাল সরকারের কাছ থেকে ওদের নিশ্চয়ই শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু আপনাদের মেরে ফেলতে পারলে পরে ওরা বলতে পারে যে আপনারা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন সেইজন্যই ওরা ফিরে গেছে।"

রানা বললেন, "শেরপারা খুব বিশ্বাসী হয়। তারা এরকম কাজ কক্ষনো করে না।"

সন্তু বলল, "মিংমা আমায় খুব ভালোবাসত। সে কক্ষনো আমাদের মারতে চাইবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "শেরপারা যদি গম্বুজের দরজা বন্ধ করেও দেয়, তবু চীনে লোকটি কোথা থেকে এল? তাকে নিশ্চয়ই

বিজয়া ব্যাঙ্ক কীভাবে আপনার সন্তানের মনের মতো জিনিস ও সুযোগ পেতে সাহায্য করে

বিজয়া ব্যাঙ্ক ৩ রকম উপায় বাতলে দিচ্ছে, যা দিয়ে আপনি ওর স্বপ্ন সফল করে তুলতে সাহায্য করতে পারেন।

১। বাল নিধি জমা প্রকল্প

এটি আপনার শিশুর সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সে তার মনের মতো টুকিটাকি জিনিষ এ দিয়ে পেতে পারে—যেমন একটা হাত ঘড়ি, একটা ক্যামেরা কিংবা একটা ক্রিকেট ব্যাট। এই দৈনন্দিন সঞ্চয় প্রকল্প অনুযায়ী বিজয়া ব্যাঙ্ক এক টাকারও কম জমা গ্রহণ করে এবং সেটা আপনার বাড়ি থেকেই ব্যাঙ্ক সংগ্রহ করে নিয়ে আসে।

২। বিজয়া শিক্ষা পরিকল্পনা ঃ ক

এই প্রকল্পটি আপনার সন্তানের উচ্চ শিক্ষার খরচ চালাতে স্যহায্য করে।

পরিকল্পনা 'ক' অনুযায়ী আপনাকে প্রথমে থোক কিছু টাকা দিতে হবে। তারপর আপনার সন্তান কলেজে ঢোকার পর ৭ বছর ধরে মাসে আপনি ১০০ টাকা করে পেয়ে যাবেন।

৩। বিজয়া শিক্ষা পরিকল্পনা ঃ খ

আপনি যদি থোক টাকা না দিয়ে শিক্ষাবাবদ মাসে মাসে টাকা জমা রাখতে চান তাহলে এই পরিকল্পনার সুযোগ নিন। এতেও আপনি আপনার সন্তানের ১৫ বছর পূর্ণ হলে ৭ বছর ধরে মাসে ১০০ টাকা করে পাবেন।

বিস্তারিত জানতে হলে বিজয়া ব্যাঙ্কে আসুন। আপনার টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখুন—আপনার কাছাকাছি এই ব্যাঙ্কের শাখা নিশ্চয়ই আছে।

বিজয়া ব্যাঙ্ক লি.

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ লাইট হাউস হিল রোড, ম্যাঙ্গালোর-৫৭৫ ০০৩
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস ঃ ২, রেসিডেন্সী রোড, ব্যাঙ্গালোর-৫৬০ ০২৫

শেরপারা আনেনি।"

রানা সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি সত্যিই ইয়েটি দেখেছ?"

সন্তু বললো, "হ্যাঁ।"

ভার্মা এবং রানা দু'জনেই সচকিত ভাবে দূরের কালাপাথর পাহাড়টার দিকে একবার তাকালেন।

কাকাবাবু বললেন, "যা বলছিলাম...ধরে নেওয়া যাক, ইয়েতি আছে। এখন দিনের বেলা, আপনাদের দু' জনের কাছেই আছে এল এম জি, আমার কাছে আছে রিভলবার। পৃথিবীতে এমন কোনও প্রাণী নেই যা এল এম জি, রিভলবারের সামনে দাঁড়াতে পারে। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী দাঁত, নখ ছাড়া আর কিছু অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে না। সুতরাং আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। তা ছাড়া, আমি মনে করি, মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান কোনো প্রাণী পৃথিবীতে থাকতে পারে না। এতকাল ধরে ইয়েতির কথা শোনা যাচ্ছে, অথচ কোনও সভ্য মানুষ একটাও ইয়েতিকে ধরতে পারেনি এমনকি একটা ছবিও তুলতে পারেনি কেন? ইয়েতি কি এতই বুদ্ধিমান? সেটাই আমাদের দেখা দরকার।"

রানা বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, এই রহস্যের সন্ধানের জন্যই কি আপনি এখানে এসেছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনারা কেইন শিপটনের কথা ভুলে যাচ্ছেন। মানুষের দাঁতের চেয়েও খুব বড় একটা দাঁত, ধরা যাক ইয়েতির দাঁত, সে সব সময় গলায় ঝুলিয়ে রাখত। সেই কেইন শিপটন এখানে এসে ইয়েতি দেখতে পেয়েছিল। অন্তত সে কথা সে তার ডায়েরিতে লিখে রেখে গেছে। তারপর কেইন শিপটন এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাকে কি ইয়েতি ধরে নিয়ে গেছে? ইয়েতি কি মানুষ খায়? কেইন শিপটনের হাড়গোড়ও খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

রানা বললেন, "অনেক খুঁজে দেখা হয়েছে। উনি সত্যিই যেন অদৃশ্য হয়ে গেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "কেইন শিপটনের অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে ইয়েতির কোনো সম্পর্ক আছে কি না, সেটা খুঁজে দেখা দরকার।"

ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিও কি সেই জন্য একটা ইয়েতির দাঁত নিয়ে এসেছেন? যদি আপনিও অদৃশ্য হয়ে যান?"

কাকাবাবু এতক্ষণ বাদে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "সত্যি কথা বলতে কি, আমি সেইজন্যই এখানে এসেছি। আমি অদৃশ্য হবার বিদ্যেটা শিখতে চাই।"

রানা বললেন, "তা হলে এখন আপনি কী করতে চান?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা সবাই মিলে এক্ষুনি কালাপাথরের দিকে এগোই না!"

রানা বললেন, "হেলিকপটারটা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হয় না? ঘন্টা দু' একের মধ্যেই তো ফিরে আসবে।"

কাকাবাবু বললেন, "হেলিকপটারে গেলে কিছুই দেখা যাবে না। অবশ্য হেলিকপটারটা আমাদের কাজে লাগবে পরে। চলুন, আমরা নিজেরাই হেঁটে যাই, অন্তত সন্তু যেখানে ইয়েতি দেখেছিল সেই পর্যন্ত। দিনের আলো অনেকক্ষণ থাকবে।"

ভার্মা বললেন, "চলুন তা হলে যাওয়া যাক।"

কাকাবাবু নিজেই আগে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন, "কেইন শিপটন যে দলের সঙ্গে এসেছিল, তারপর আর কোনো অভিযাত্রী দল এই পথ দিয়ে এভারেস্টের দিকে যায়নি। আর একটি জাপানি দল এসেছিল, তারা এই জায়গা থেকেই ফিরে যায়। কী যেন একটা রহস্যময় অসুখ হয়েছিল তাদের।"

রানা জিজ্ঞেস করলেন, "খাবারের পাত্র আর কফির ফ্লাস্ক দুটো এখানেই থাক তা হলে।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ! এখানে তো চোরের ভয় নেই। আর, আশা করি ইয়েতিরা কাপ ডিশ কিংবা ফ্লাস্ক ব্যবহার করে না।"

সন্তু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "কাকাবাবু, ঐ দেখুন!"

সকলে একসঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

গম্বুজটার পাশ দিয়ে নীল কোট পরা একজন লোক এই দিকে হেঁটে আসছে।

রানা আর ভার্মা সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের লাইট মেশিন গান দুটি তুলে ধরলেন লোকটির দিকে। কাকাবাবুও রিভলবারটা বার করলেন।

সন্তুই আবার হাত তুলে বলল, "মারবেন না, মারবেন না!"

(ক্রমশ)

...শিশুপ্রাণ বসবাস করে আগামী দিনের ঘরে
সেখানে তোমার আমার প্রবেশ নিষেধ,
যার চাবির হদিস স্বপ্নেও পাবেনা তুমি।

ওদের মত হব বলে প্রয়াসী হতে পারো তুমি
কিন্তু, কখনও নিজের আদলে
ওদের গড়তে চেওনা।

কারণ জীবন যায় না ফিরে
থাকেনা থেমে, গত কালকের ঘরে...

স্টীল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
সেণ্ট্রাল মার্কেটিং অরগানাইজেসন
২-ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১

CA/CMO/799

মালিনীর কথা

তুষার পণ্ডিত

ছোট্ট মেয়ে মালিনী। মোটে পাঁচ বছর বয়স। এরই মধ্যে খুদে খুদে আঙুল দিয়ে পিয়ানো বাজিয়ে সে বড়দের পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আমেরিকার উইসকনসিন রাজ্যের নিনা শহরে মালিনী তো এই বয়সেই মিনি ভি আই পি। ওই শহরের প্রধান সংবাদপত্র 'টুইন সিটি নিউজ রেকরড'-এর প্রথম পাতায় ছবি দিয়ে বেশ ফলাও করে তার কৃতিত্বের কথা বেরিয়েছে।

বাজনার হাতেখড়ি তো মাত্র সেদিন। গত বছরের জানুয়ারি মাসে। এরই মধ্যে সে কুড়িটারও বেশি ইংরেজি সুর আয়ত্ত করে ফেলেছে। বাবা ডঃ অরুণ চট্টোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিক।

সম্প্রতি মালিনী তার বাজনার কিছু নমুনা পাঠিয়েছে টেপ করে তার ঠাকুরদা শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের কলকাতার ঠিকানায়। এক সময়ের ডাকসাইটে জজসাহেব এখন সময় পেলেই নাতনির বাজনা শুনে তন্ময় হয়ে যান। বাজনার ফাঁকে ফাঁকে সংলাপও আছে। "দাদু, জানো এই গতটা আমি নিজে বানিয়েছি। কেমন লাগল?" এমনি বেশ কয়েকবার। তখন গোপালবাবুর কী হাসি। বলেন: "দেখছ, মেয়ের কাণ্ড।"

ছোটদের খেলা শেখাচ্ছেন জাদুকর ধ্যানচাঁদ

জাদুকর ধ্যানচাঁদ

১৯৩৬ সালে বার্লিনে একটি খেলা মাঝপথে হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন আম্পায়ার। কী ব্যাপার? আম্পায়ার ছুটে এসে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ধ্যানচাঁদের স্টিকটি গম্ভীরভাবে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষা করে হতাশ হলেন তিনি। খেলা শুরু হল আবার। ধ্যানচাঁদের স্টিকের ওপর আগের মতোই নাচতে শুরু করল বল। পরে জানা গেল খেলা বন্ধের কারণ। আম্পায়ার ভেবেছিলেন, স্টিকে নিশ্চয়ই কিছু লাগানো আছে। না হলে, বল ওভাবে সরু স্টিকের ওপর ক্রমাগত লাফায় কী করে?

জন্ম এলাহাবাদে, ১৯০৫ সালে। ষোলো বছর বয়সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯২৬ সালে ভারতীয় সেনাদলের হয়ে নিউজিল্যান্ডে খেলতে গিয়ে চমকে দেন সবাইকে। ১৯২৮, ১৯৩২ এবং ১৯৩৬ সালের অলিম্পিকে ভারতের সোনা পাওয়ার পেছনে ধ্যানচাঁদের অসাধারণ ভূমিকা ছিল। হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ আজ আর আমাদের মধ্যে নেই।

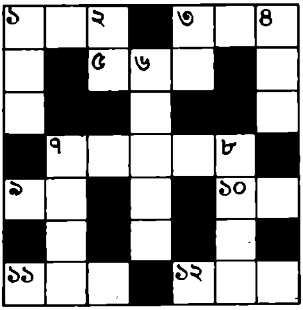

সংকেত : পাশাপাশি : (১) নোবেল-বিজয়ী এক বিদেশী কবির সংক্ষিপ্ত নাম। (৩) কন্যা। (৫) উন্মাদ। (৭ একটি পর্বত। (৯) একমাত্র ফল যা গানবাজনায় লাগে। (১০) প্রচলিত নিয়ম। (১১) প্রবাদ, প্রাচীন ভারতের এক মুনি নাকি প্রথম এই ভাষার চর্চা করেছিলেন। (১২) বিখ্যাত এক গুপ্ত-সম্রাটের উপাধি।

উপর-নীচ : (১) কুকুরজাতীয় প্রাণী। (২) যে-খেলায় ধৈর্য আর বুদ্ধি দুইই চাই। (৩) রামের সহায়ক বানর। (৪) উড়িধান। (৬) দক্ষিণ-ভারতের বন্দর। (৭) দুর্লভ বস্তু ভাগবাঁটোয়ারার কথা উঠলেই যার নাম মনে পড়ে। (৮) কেবলমাত্র মরুভূমিতেই দেখা যায়।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় সমাধান

ক	চ	■	■	■	ম	দ্র
■	ক	ম্বু	■	থা	ন্ড	ব
ভী	ম	■	■	ল	■	ণ
■	কি	স্তি	■	সা	ম	■
কো	■	মি	■	■	থ	রা
কি	রা	ত	■	হে	ম	■
ল	গি	■	■	■	ল	ম্ব

বিশাল একটা দেওয়াল-ঘড়ি কিনে এনেছে ছোট্কা, ছোড়দির জন্মদিনে।

আমাদের বাড়িতে অনেক আগে একটা দেওয়াল-ঘড়ি ছিল, কিন্তু এখন সেটার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। বহুকাল অকেজো হয়ে পড়ে ছিল। পাঁচ-সাত বছর আগেও সেটা দেখেছি কুলুঙ্গিতে কাত করে রাখা, ওপরে ধুলোর সর পড়েছে পুরু হয়ে। ইদানীং আর দেখি না।

ছোটকার কেনা ঘড়িটা অবশ্য আগেরটার থেকে অনেক সুন্দর

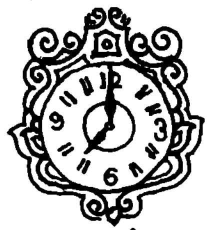

দেখতে, অনেক বাহারি। সব থেকে যেটা ভাল লাগে ঘণ্টাটা খুব মিষ্টি শুনতে। প্রত্যেক পনেরো মিনিট পর-পর টুং করে একটা আওয়াজ হয়। প্রত্যেক ঘণ্টায় টুং-টুং করে বাজে। যত ঘণ্টা, তত-গুলো টুং আওয়াজ। যেমন ধরো, আটটা বাজল, আটবার টুংটুং শব্দ হবে। সোয়া আট বাজলে একবার, সাড়ে আটটায় একবার, পোনে নটায় একবার, ফের নটায় নবার টুংটুং আওয়াজ।

তা ঘড়িটা নিয়েই যে ছোট্কা একটা মজার ধাঁধা বানিয়ে ফেলবে কে জানত।

আমি সেদিন ধাঁধা চাইতে গেছি, ছোট্কা বলল, "কী নিয়ে ধাঁধা দেব সতুবাবু সেটাই ভাবছি।"

আমি বললাম, "কেন, ঘড়ি নিয়ে দাও না। তুমি তো সব জিনিস নিয়েই ধাঁধা বানাতে পারো।"

ছোটকা চুপ করে শুনল কথাটা। তারপর কিছুক্ষণ ধরে মনে মনে কী যেন একটা হিসেব করল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বেশ, আমাদের এই ঘড়িটা নিয়েই এবারের প্রথম ধাঁধা হোক। লিখে নাও।"

আমি লিখে ফেললাম।

প্রথম ধাঁধা ॥ একটা দেওয়াল-ঘড়িতে প্রত্যেক পনেরো মিনিট পর-পর একবার টুং করে আওয়াজ হয়। প্রত্যেক ঘণ্টায় টুংটুং করে বেজে সময় জানিয়ে দেয় ঘড়িটা। যত ঘণ্টা, ততবার টুং আওয়াজ।

একজন পাশের ঘর থেকে ঘড়ির আওয়াজ শুনছে একদিন। সে শুনল, টুং করে একটা আওয়াজ। কিছুক্ষণ বাদে ফের টুং করে একটা আওয়াজ। এই-ভাবে কিছুক্ষণ পর-পর সাতবার সে আওয়াজ পেল, সাতবারই একটা করে মাত্র আওয়াজ হল।

বলতে পারো, কোন সময় থেকে কোন সময়ের মধ্যে সে আওয়াজ শুনছিল, যাতে সাত-বারই একটা করে টুং আওয়াজ বাজল ঘড়িটায়?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ ডাক্তার যদি তোমায় নটা ট্যাবলেট দিয়ে বলে আধ ঘণ্টা পরপর একটা করে ট্যাবলেট খেয়ে যাবে, তাহলে শুরু থেকে কত ঘণ্টা লাগবে সব কটা খেতে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ উপযুক্ত সংখ্যা বসাও

১৫ ১৩ ১২ ১১ ৯ ৯?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ বেমানান সংখ্যা কোনটি?

৪৯, ৯১, ৩৭, ১১২, ১৩৩, ১৫৪

গতবারের উত্তর ॥ (১) উপদেশটা যেহেতু সুন্দরকাকারই, তাই সুন্দরকাকাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেই ভেবেছিলেন, কাকিমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কাকিমাও সুন্দরকাকার কথা মনে রেখেই, নড়েননি জায়গা ছেড়ে। সে-জন্যেই দেখা হয়নি দুজনের। (২) হ অক্ষরটা। (৩) ১ থেকে ০ পর্যন্ত সব কটি সংখ্যাই রয়েছে অঙ্কটায়। (৪) এরকম আরেকটা অঙ্ক—২×১৪×৩০৭=৮৫৯৬

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল
ব্যাটারির মুখের ছবি
ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ প্রথম যখন দেখতে পেলে যে তোমাদের বাগানের কাঁঠাল গাছে একটা কাঁঠাল ফলেছে, কী করবে?
উঃ দাদুর গোঁফে তেল মাখিয়ে দেব।

প্রঃ পা ভেঙে একজন লোক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। মাঝরাতে যদি তার খুব যন্ত্রণা শুরু হয়, তার কি হেড নার্সকে ডাকা উচিত নয়?
উঃ পায়ের ব্যথায় হেড নার্স কী করবে? লেগ নার্সকে ডাকা উচিত।

প্রঃ সন্ধেবেলা ডাক্তারবাবুর চেম্বারে টেলিফোনে খবর এল, তাঁর স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারবাবু তখন কী করবেন?
উঃ রাত্রিতে বাড়ি ফেরার পথে ডিনারটা কোনো রেস্টুরেন্টে সেরে যাবেন। স্ত্রী তো রান্না করতে পারবেন না।

সুসেন

মজার খেলা

এ খেলাটা দেখাতে লাগবে ৯টি দেশলাই কাঠি, ব্যস, আর কিছু নয়।

প্রথমে চারটি দেশলাইকাঠিকে টেবিলের ওপর সোজা করে পরপর সাজিয়ে রাখো, নীচের ছবির মতন :

বন্ধুদের কাউকে এই কাঠি-গুলো দেখিয়ে বলো, এখানে চারটে কাঠি রয়েছে, এই নাও তোমাকে আরো পাঁচটা কাঠি দিলাম। তুমি এই পাঁচটা কাঠি যোগ করে দশ বানাতে পারো? (দরকার হলে ইংরেজিতে বলো বন্ধুকে, মেক টেন। কেন বলতে বলছি, তা পরে বুঝতে পারবে।)

বন্ধু তোমার হাত থেকে পাঁচটা কাঠি নিয়ে চেষ্টা করবে। কিন্তু কৌশলটা জানা না থাকলে পারবে না। সুতরাং একটু পরেই বলবে, হয় না। তুমি করে দেখাও।

তুমি তখন পাঁচটা কাঠি নিয়ে কী করবে জানো? তেমন কিছুই নয়। শুধু কাঠিগুলিকে নিয়ে সাজিয়ে দেওয়া যাতে ইংরেজিতে টেন শব্দটা পড়া যায়।

নীচের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা।

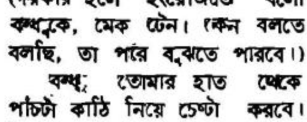

পাঁচটা কাঠি কীভাবে বসাবে তা......চিহ্ন দিয়ে দেখানো হল।

মজারু

হাসিখুশি

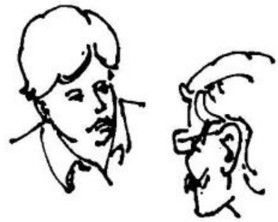

নতুন ইতিহাস-শিক্ষক প্রথম দিন ক্লাস নিতে এসে একটি ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বলো তো, অমৃতসর সন্ধি কী?" ছেলেটি প্রথমটায় একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর সামলে নিয়ে বেশ সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল, "আজ্ঞে স্যার, অমৃত-সর= অমৃতসর।" শিক্ষক মৃদু হেসে তাকে ইঙ্গিতে বসতে বলে পাশের ছেলেটিকে বললেন, "তুমি বলো।" সে যেন তৈরিই ছিল, চটপট উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এটা তো সন্ধি হবে না স্যার, সমাস হবে—অমৃতের সর—ষষ্ঠীতৎপুরুষ।"

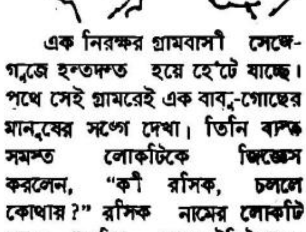

এক নিরক্ষর গ্রামবাসী সেজে-গুজে হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পথে সেই গ্রামেরই এক বাবু-গোছের মানুষের সঙ্গে দেখা। তিনি ব্যস্তসমস্ত লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রসিক, চললে কোথায়?" রসিক নামের লোকটি বলল, "যাচ্ছি বাবু ইস্টিশানে, একটু গঞ্জে যাব।" বাবুটি ভুরু কোঁচকালেন, "গাড়ি তো সেই বিকেলে—এই ভরদুপুরে যাচ্ছ কেন?" রসিক বলল, "একটু আগেই যাওয়া ভাল বাবু, কল-কব্জার ব্যাপার, কখন হুস করে চলে যায় তার কি ঠিক আছে।"

ছবি রতন সেন

Child ...1
শিশুরা হাসবে, খেলবে, পড়বে–
এমনকি কাঁদবেও। কিন্তু না,
কান্নাই একমাত্র সম্বল
করতে দেব না।
শিশুর সেবাই ব্রত—এমন কিছু মানুষ ও সংগঠন চিরকাল রয়েছে, থাকবে। কিন্তু আমরা নাই বা গেলাম বিরাট কোন আয়োজনে বা সংগঠনে। যে শিশুটি দাঁড়িয়ে আছে আমার ঘরের পাশে—চলুন তার দাবিতেই এগিয়ে চলি।
শুধু এক বছরের সভা আর প্রদর্শনীর ভীড়ে যেন চাপা না পড়ে এই সব কোমলতনু শিশুরা। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের আদর্শ হোক অনির্বাণ। আজ আমরা এদের ভার নেব। এরাই তো ভবিষ্যতে বহন করবে সমগ্র মানবসমাজের উত্তরদায়। শুধু মিষ্টি কথা নয়। আরও একটু কিছু...... আহার, আবরণ, সুশিক্ষা—সতেজ দেহ সবার চেয়ে দামী কিন্তু উষ্ণ স্নেহের কোমল স্পর্শ।
এই বিজ্ঞাপনটি
আন্তর্জাতিক
শিশুবর্ষের সৌজন্যে
পিগ্ আয়রণ
সাপ্লায়িং সিণ্ডিকেট
প্রাইভেট লিমিটেড
কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৩৫ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০১
VIJAY DIWAN/PG/C1/B79

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

সস্ত্রীক চুনী গোস্বামী

॥৩৩॥

চৌষট্টি সালের গোড়ার দিকে আমার বিয়ে হয়ে গেল। অনেকে বললেন, পূর্ব-পশ্চিমে মিলন হল।

বিয়ের আগে ক্লাব মজলিশে অনেকের কাছে একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে—“মেয়েটি কোথাকার? পূর্ববঙ্গের, না পশ্চিমবঙ্গের?” এপার-বাংলার যাঁদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেশি তাঁরা সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছেন, “বাঙ্গাল নয় তো?” যখন রসিকতা করে বলেছি, মেয়ে পূর্ব-বঙ্গের, তখন মুখে সবাই ভাল ভাল বললেও একটু যেন চাপা মতো বেজার ভাবের আঁচ পেয়েছি।

খবরটা জানাজানি হতে অবশ্য বেশি সময় লাগেনি। পশ্চিমবঙ্গের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে জেনে অনেকেই খুব খুশি হলেন। বিয়ের পর আমার ‘শুদ্ধি’ হয়ে গেল।

মোহনবাগান ক্লাবের বহু বন্ধুবান্ধবের কাছে, এমন-কী বলাইদার কাছেও আমি ছিলুম আধা-ঘটি, আধা-বাঙাল। শান্তিপুরে শ্বশুরবাড়ি হবার পর হয়ে গেলুম পুরো ঘটি।

বলাইদা নিজের ছেলের চেয়েও বোধ হয় আমাকে বেশি ভালবাসতেন। তিনি তো দারুণ খুশি। বলাইদা ছিলেন মন-খোলা মানুষ। রেখে-ঢেকে কথা বলতে পারতেন না। পূর্ববঙ্গের পরিচিত ছেলেদের তিনি খোলাখুলি বলতেন “জার্মান”। ওটা ছিল তাঁর মুখের বুলি। ভালবাসার বুলিও বলতে পারো। ভাল খেললে বলতেন, ব্যাটা জার্মান দারুণ খেলেছে। খারাপ খেললে বলতেন, জার্মানটাই ডুবিয়েছে। আমার বিয়ের পর তিনি বলতে শুরু করলেন, “দেখলে তো, চুনীকে কেমন খাঁটি ঘটি বানিয়ে দিলুম।”

ঘটনার কেমন যোগাযোগ দ্যাখো।

প্রথম ডিভিশনে খেলতে শুরু করার পর থেকে তেষট্টি সাল পর্যন্ত কলকাতার মাঠে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে আমি কোনো গোল করতে পারিনি বলে মোহনবাগান শিবিরের কিছু-কিছু মানুষের মধ্যে একটা কথা চালু হয়ে গিয়েছিল। আমি নাকি ইচ্ছে করেই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোল করি না। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে মোহনবাগানের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কে কেমন খেলবে—এই নিয়ে আলোচনা শুরু হলেই অনেকে বলতেন, “ওঃ চুনী? দারুণ খেলবে, কিন্তু গোল করবে না।” এই অহেতুক অপবাদ সত্ত্বেও আমার প্রতি মোহনবাগানের সব শ্রেণীর সভ্য-সমর্থক

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। খেলা শুরুর পূর্বমুহূর্তে

এবং কর্মকর্তাদের অকৃপণ ভালবাসায় কোনো দিন কণামাত্র ঘাটতি দেখিনি। জোর করেই বলছি, পূর্ববঙ্গের যাঁরা মোহনবাগানে খেলেছেন, তাঁদের মধ্যে ফুটবলের প্রবাদ-পুরুষ গোষ্ঠ পাল ছাড়া আমার মতো এত ভালবাসা আর কে পেয়েছে? এবং আজ হলফ করে বলছি যে-দলের সঙ্গেই খেলা থাক, গুরুত্বপূর্ণ কোনো খেলায় গোল করার চেষ্টায় একটুও ঢিলে দিইনি।

পি-কে-রও এমন একটি অপবাদ ছিল। সে নাকি ইচ্ছে করে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল করত না। পূর্ববঙ্গের ছেলে মোহন-বাগানে খেলুক, আর পশ্চিমবঙ্গের ছেলে খেলুক ইস্টবেঙ্গলে, খেলতে নেমে কেউ ইচ্ছে করে গোল করেনি—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। কোনো স্পোর্টসম্যান কি এমন আচরণ করতে পারে? আসল কথা, তেষট্টি সাল পর্যন্ত কলকাতার মাঠে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে আমি গোল পাইনি, তা সেটা সুযোগ সদ্ব্যবহারে আমার ব্যর্থতার ফলেই হোক, কিংবা আমাকে ভীষণভাবে গার্ড করে খেলার ফলেই হোক।

বিয়ের পর কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোল পেয়ে গেলুম। বলাইদা রসিকতা করে হাসতে-হাসতে বললেন, "দেখলি তো, পশ্চিমবাংলার মেয়েকে বিয়ে করার গুণ।"

গোলটি করেছিলুম চৌষট্টিতে রিটার্ন লীগের খেলায়। পঁচাত্তরে ইডেনে পনেরো সেকেন্ড না সতেরো সেকেন্ডে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের আকবর যে গোলটি করেছে, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে কুইকেস্ট গোল হিসাবে সেটি রেকর্ড হয়ে আছে। ওই ধরনের গোলই পেতুম যদি প্রথম মিনিটেই আমার হেড-করা বল ইস্টবেঙ্গল গোলকীপারের হাতে ও পোস্টে লেগে ফিরে না আসত। আমার বদলে গোলটি পেল অশোক চ্যাটার্জি। বল ফিরে আসার পর সহজেই সে জালের মধ্যে পাঠাল। তবে প্রথম মিনিটে গোল না পাবার আফশোস আর আমার ছিল না আট মিনিটের সময় মাঠ-মাতানো একটি গোল করার পর। যা করতে চেয়েছিলুম তাই-ই করতে পেরেছিলুম। তিনজন ডিফেন্ডারকে পরপর কাটিয়েছিলুম পরিচ্ছন্ন পায়ের কাজের সঙ্গে গতির চমকে। তারপর যে শটটি করে-ছিলুম, সেটিও ছিল মাটি-ঘেঁষা দুর্দান্ত শট। গোলকীপার বল আটকাবার কোনো সুযোগই পায়নি। গোলের সঙ্গে-সঙ্গে সারা মাঠে সে কী চিৎকার! ইস্টবেঙ্গলকে প্রায় নাস্তানাবুদ করে সে-ম্যাচ আমরা জিতেছিলুম ৩—১ গোলে। দ্বিতীয়ার্ধের নয় মিনিটের সময় আমাদের তৃতীয় গোলটি করেছিল অরুময়। ইস্টবেঙ্গলের শম্ভু দাসচৌধুরী একটি গোল শোধ করেছিল, শেষ সময়ের পরে।

কথাটা নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে বিদঘুটে লাগছে। ভাবছ, শেষ সময়ের পরে আবার গোল হয় কীভাবে? হ্যাঁ, তা-ই হয়েছিল। তখন লীগের খেলা হত প্রতি অর্ধে পঁচিশ মিনিট করে মোট পঞ্চাশ মিনিট। শম্ভু গোল করেছিল দ্বিতীয়ার্ধের ২৭ মিনিটে। খেলাটি হয়েছিল আগস্ট মাসের আট তারিখে। খবরের কাগজের পুরনো ফাইল খুললেই ব্যাপারটি দেখতে পাবে।

ওই বছর ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের লীগের প্রথম ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছিল। শীল্ড ফাইনালে আবার মুখোমুখি হল দুই প্রধান। আমাদের টীমের ফর্ম খুবই ভাল ছিল। পি-কে-র ইস্টার্ন রেলকে সেমি-ফাইনালে আমরা হারালুম ৩—০ গোলে। গোল করলুম আমি, সারমাদ খাঁ ও অশোক। অসীম মৌলিকের এক দুর্দান্ত গোলে সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল হারাল বি এন রেলকে। ফাইনালে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল আমাদের উপর টেক্কা দিল। তবে জিতেও শীল্ড পেল না।

আবার কথাটা হয়তো বিদঘুটে ঠেকছে, তাই না? ইস্টবেঙ্গল সত্যিই ভাল খেলেছিল এবং ওই অসীম মৌলিকই করেছিল দেখার মতো শটে মনে রাখার মতো একটি গোল। খেলা শেষ হতে যখন দু মিনিট বাকি, আমরা পেলুম একটি পেনাল্টি-কিক, সেটা আমাদের ন্যায্য পাওনা ছিল না। ইস্টবেঙ্গলের ব্যাক মুস্তাক আমেদ পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে অশোককে অবস্ট্রাকট করেছিল। অর্থাৎ অবৈধ-ভাবে বাধা দিয়েছিল, যার শাস্তি ইনডাইরেকট ফ্রী-কিক। যে নয়টি অপরাধে পেনাল্টি কিক দেওয়া হয়, সে অপরাধ নয়। যাই হোক, পেনাল্টি-কিক থেকে জারনেল সিং গোল শোধ করে দিল। ইস্টবেঙ্গলও বঞ্চিত হল শীল্ড লাভ থেকে। সে-বছর আর ফাইনাল খেলা হয়নি। (ক্রমশ)

জলরঙ

বিজয় পাল

দোতলার ঝুলবারান্দা থেকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে এসে সদর দরজার পাশে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইল তিতলি। পায়ের শব্দ দরজার ওপারে এসে থামল। এবারে কলিং বেল বেজে উঠবে। কিন্তু তার আগেই দরজা খুলে দিয়ে তিতলি ভয়-ভয় মিষ্টি-মিষ্টি মুখ বার করে ফিসফিসিয়ে শুধোল, "বাবা, এনেছ?"

ডান দিকে হেলে বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুটো বাক্স বার করে সোমনাথবাবু বললেন, "এই নে।"

তিতলির দিদি মিতলি ইংরেজি স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ে। সবেতেই তার চিমটি কাটা স্বভাব। আর কী কথা! পাছে সে দেখে ফেলে, তিতলি বাবার হাত থেকে ছোঁ মেরে বাক্স দুটো নিয়ে লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু সে সময়টুকুও দিল না মিতলি। যেন কিছুর গন্ধ পেয়েছে এমনি মুখ করে বলল, "কী রে তিতলি? ক্যাডবেরি?"

হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়ে বোকা-বোকা মুখ করে তিতলি বলল, "রঙ।"

"রঙ!" মিতলি অবাক। রঙ নিয়ে তুই কী করবি?"

তিতলির ইচ্ছে হল বলে, খাব। বলল না। যা মেয়ে! এই নিয়ে এক্ষুনি কুরুক্ষেত্র বাধাবে। তার চেয়ে সত্যি কথা বলাই ভাল। বলল, "ছবি আঁকব।"

শুনে মিতলির কী হাসি! খিলখিল করে হাসতে হাসতে একসময় খুকখুক করে কাসতে শুরু করে দিল। মিতলি হাসতে হাসতে কাসছে, কাসতে কাসতে হাসছে। আর তাই শুনে বাড়ির যে যেখানে ছিল সবাই এসে জড়ো হল দরজার কাছে। এমনকী নিতাইও। ছোটমা বললেন, "হাসছ কেন মিতলি? কী হল?" শুনে মিতলির হাসি আর কাসি দুইই বেড়ে গেল। ছোট্‌কা ধমক লাগালেন, "এই মিতলি—"

তা কে শোনে কার কথা? মা রান্নাঘরে ছিলেন। হলুদমাখা হাত শাড়ির আঁচলে মুছতে মুছতে এসে পৌঁছোলেন সেইমাত্র। শেষমেষ তিনি চোখ পাকাতেই হাসি ছেড়ে শুধু কাসি শুরু হল। সঙ্গে অবিরাম হেঁচকি। মা তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এনে জোর করে খাইয়ে দিতে তবে শান্তি। গলা ঝেড়ে সাফ করে মিতলি বলল, "জানো মা, তিতলি না ছবি আঁকবে! আর তাইজন্য বাবা লুকিয়ে লুকিয়ে শুধু তিতলির জন্য রঙ এনেছেন।"

ছোট্‌কা বললেন, "তোর তো আছে।"

বাবা হেসে বললেন, "তাতে কী, ওর আছে বলে ও পাবে না?" বলে ফের বাঁ দিকে হেলে ডান পকেটে ডান হাত ঢুকিয়ে দক্ষ ম্যাজিসিয়ানের মতো আরো দুটো রঙের বাক্স বার করে মিতলিকে দিয়ে বললেন, "এগুলো তোর।"

মিতলি বাক্স দুটো নেড়েচেড়ে ঠোঁট উলটে বলল, "এ তো একদম সস্তা রঙ। কী বিচ্ছিরি আর ম্যাটমেটে। এর চেয়ে কেটোর কিছু পেলে না?"

সোমনাথবাবু বিব্রতমুখে বললেন, "দোকানে যে বলল, বাচ্চাদের পক্ষে এই নাকি সবচেয়ে ভাল —"

"তাই বল, এগুলো বাচ্চা মানে বোঁবদের জন্য। তা তিতলির কাজে দেবে খুব।" বলে মিতলি মুখ মটকে হাসল। তারপর আবার বলল, "আমি কিন্তু কমপিটিশানে এ কালার ইউজ করব না তা আগেই বলে দিচ্ছি মা।"

মা বললেন, "ঠিক আছে, সে পরে দেখা যাবে। এখন তো ঘরে চল্।"

সদর দরজা বন্ধ করে সবাই ড্রইংরুমে এসে বসল। মা নিতাইকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিলেন চা করে আনতে। বাবা শুধোলেন, "কিসের কমপিটিশান রে মিতলি?"

"ওমা, তুমি জানো না?" বলে মিতলি গড়গড় করে নেতাজী সঙ্ঘের মাঠে সেদিন বিকেলে যে বসে-আঁকো প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা তার বিশদ বিবরণ দিতে শুরু করল। কোনো এনট্রি ফী নেই। আগে থেকে নাম দেওয়ার ঝামেলা নেই। রঙের বাছবিচার নেই। গিয়ে বসলেই হল। কণ্ডিশান? মোটমাট তিনটে। এক, এজ লিমিট আট থেকে চোদ্দ। দুই, ছবির সাবজেক্ট জানাবে সবাই রেডি হয়ে বসার পর। তিন, ছবি আঁকা শেষ করতে হবে ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিটে।

"এ তো দারুণ মজার ব্যাপার রে!" নিতাই চা দিয়ে গিয়েছিল। সোমনাথবাবু গরম চায়ে আরাম করে চুমুক দিলে বললেন, "তা তিতলি আঁকবে না?"

মিতলি বলল, "ও তো ভাল করে মার্জিনের দাগই টানতে পারে না, ছবি আঁকবে কী?"

ডাহা মিথ্যে কথা। প্রথম প্রথম মার্জিন টানতে অসুবিধে হত ঠিকই, কিন্তু সে তো অনেক বছর আগের ব্যাপার। তখন তিতলি সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আর এখন সে পড়ে ক্লাস ফোরে। চোখের পলকে মার্জিন টানে। মিতলির মতো ভাল না হোক, একটু-আধটু ছবিও আঁকতে পারে। কিন্তু এত সব জেনেও তিতলিটা একটা অকম্মার ধাড়ি—এতখানি মিথ্যে বলতে একটুও বাধল না মিতলির!

তিতলি মুখ নামিয়ে বসে ছিল। ছোট্‌কা সেদিকে আড় চোখে তাকিয়ে মিতলিকে শুধোলেন, "ছবি আঁকা খুব কঠিন বুঝি? অঙ্কের মতো?"

মিতলি অঙ্কে কাঁচা। বাংলা স্কুলে পড়েও তিতলি যেখানে হেসেখেলে একশোতে একশো পায় সেখানে যাট-সত্তর তুলতেই মিতলির জিভ বেরিয়ে এই! তাই আমতা-আমতা করে বলল, "অতটা কঠিন নয়, তবে সোজাও বলা চলে না।"

অঙ্কের মতো কঠিন নয়, আবার সোজাও নয়? চিন্তিত মুখে ছোট্‌কা বলছিলেন, "এ যে দেখছি ধাঁধা হয়ে গেল রে!"

শুধু এই কেন, এতক্ষণ ধরে মিতলি যা-যা করল, যা সব বলছিল সেগুলোও তো ধাঁধা। আসলে সক্কালবেলায় সামান্য রঙ নিয়ে বাবা, বিশেষ করে তিতলির তার সঙ্গে লুকোচুরির ব্যাপারটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। ভারী গুজগুজে স্বভাব তার বোনটার। কেন রে বাপু, তোর রঙ কি আমি মুখে মাখব, না চাটনির মতো চেটেপুটে খাব যে তুই অমনি করলি। আমি কি তোর শত্রু? আর ছোট্‌কাটাও তেমনি! কিছু বুঝলেন না, জানলেন না, তিতলির ছিঁচকাঁদুনে মুখ দেখেই তার পক্ষ নিয়ে অঙ্কের খোঁটা দিচ্ছেন মিতলিকে। মিতলি কাঁদতে চাইল। চোখে জল আসছে না দেখে রেগে উঠল বেজায়। বলল, "ও তুমি বুঝবে না।"

বুঝে কাজও নেই। ছোট্‌কা গলায় জোর দিয়ে বললেন, "ছবি আঁকতে পারুক চাই না পারুক, আমার সঙ্গে তিতলিও যাবে।"

মিতলি ততোধিক জোরে বলল, "যাক না, কে বারণ করেছে যেতে? তবে আমি তোমার সঙ্গে যাব না।"

বাবা বললেন, "আর কারো সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই তোদের, আমি নিয়ে যাব। হল তো?"

সোমনাথবাবুর যে কথা সেই কাজ। চারটে বাজার আগেই দু'মেয়ের হাত দুই শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে নেতাজী সঙ্ঘের মাঠে এসে হাজির হলেন। নানাবয়সী ছেলেমেয়েরা সবুজ ঘাসের মাঠে বসেছিল যেন নানারঙের ফোটা ফুল। মাঠের বাইরে তাদের মা মাসি বাবা কাকাদের ভিড়। মেয়েদের মাঠে পাঠিয়ে দিয়ে বড়দের ভিড়ে মিশে গেলেন তিনি।

ঠিক চারটেয় ছবি আঁকা শুরু হল। বিষয় 'কলকাতার বন্যা'। মিতলি তো মহা খুশি। সেবারে কলকাতায় যখন ভীষণ বন্যা হল, চারদিকে শুধু জল আর জল, অফিস-আদালত বাজারহাট খাওয়াদাওয়া সব বন্ধ, ঠিক তার দুদিন আগে ড্যাং ড্যাং করে লাফাতে লাফাতে দাদুর সঙ্গে জামতাড়ায় চলে গিয়েছিল তিতলি। উইকলি টেস্টের জন্য মিতলি পড়ে রইল কলকাতায়। যেমন একা একা মামার বাড়ি যাওয়া! এখন বোঝ মজা!

ওদিকে তিতলি বন্যার সময় জামতাড়ায় কেন গিয়েছিল সেই দুঃখে খানিক আঙুল ভাঙল। খানিক দাঁতে ঠোঁট কাটল। শেষে খবরের কাগজে দেখা বন্যার সময়কার কলকাতার একটা ছবির কথা মনে রেখে প্রথমে পেনসিল দিয়ে আধডোবা কতগুলি বাড়ি, কিছু লাইটপোস্ট, জলে গুঁড়িনামানো একটা গাছ, মাথাভাসানো একটা কুকুর আঁকল। বন্যার ছবি বলে কথা! জলরঙ বুলিয়ে চলল একমনে। এবারে বাকি রইল শুধু আকাশ আর জল। হাঁদার মতন কিছু না ভেবেই নীল করে দিল সব। তখনই খবরের কাগজের ঘোলা ঘোলা ময়লা ময়লা ছবিটার কথা মনে পড়ল ফের। সেই সঙ্গে হাতের ধাক্কায় জলের পাত্রটা উলটে গিয়ে সব জল গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। মুহূর্তে তা শুষে খেল মাটি।

ডাকলেও শুনতে পাবেন না, বাবা এত দূরে দাঁড়িয়ে। উদ্যোক্তাদের সকলেই ক্লাবঘরের বারান্দায়। একমাত্র মিতলিই যা কাছাকাছি। ওর কাছে জল চাইতে পারত। কিন্তু সেই সকাল থেকেই আড়ি চলছে যে। জল চাইবে কোন্ লজ্জায়? দু'চোখ জুড়ে মেঘ ঘনিয়ে এল তিতলির। বর্ষাকালের বৃষ্টির মতো ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে। চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়ছিল ছবিতে সে খেয়ালই নেই। সময় ফুরিয়ে যেতে একজন লোক এসে যখন ছবি তুলে নিয়ে গেলেন কিছুই বলতে পারল না তিতলি। শুধু দৌড়ে গিয়ে বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "বাড়ি চল।" ততক্ষণে মিতলিও এসে পড়েছে। সোমনাথবাবু জায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন, "আগে রেজাল্ট বেরোক।"

রেজাল্ট বেরোল। মাইকে ঘোষণা করা

ছবির মজা

এই থলির মধ্যে কত রকমের গুলি আছে, এবং কোন্ রকমের গুলি কটা আছে, তোমার ছোট ভাই কিংবা বোনকে জিজ্ঞেস করো। উত্তর ঠিক হলে তাকে একটা লজেন্স দাও।

এই ছবিতে দুটো পাতিহাঁস, দুটো রাজহাঁস আর দুটো মাছ আছে। তোমার ছোট ভাই কিংবা বোনকে বলো, সে খুঁজে বার করুক। পারলে তাকে আর-একটা লজেন্স দাও।

হল, প্রথম দেবারতি বসু। মিতলির চিৎকার আর অনেকের চটপট হাততালির আওয়াজ ছাপিয়ে বাকিদের নাম শোনা গেল না। মিতলি খালি লাফাচ্ছে আর গলা ফাটিয়ে বলছে, "আমি জানতাম, আমি তখনই জানতাম।"

তিতলি বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে একবার মিতলিকে একবার বাবাকে দেখছিল। সোমনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, "কী জানতিস?"

"ঐ যে বলল, ফার্স্ট দেবারতি বসু—আমি জানতাম।"

"কী করে?"

বিজ্ঞের মতো মুখ করে মিতলি বলল, "বা রে! চোখের জলের একটা ভ্যালু আছে তো।"

"কী সব আবোলতাবোল বকছিস?" সোমনাথবাবুকে অস্থির দেখাচ্ছিল। "তোর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।"

মিতলি তখন জল পড়ে যাওয়ার পর দেবারতি কীভাবে গোটা ব্যাপারটা কান্না দিয়ে ম্যানেজ করেছিল তার বিশদ বর্ণনা শেষ করে বলল, "নীলের ওপর কাজলগোলা চোখের জল মিশে জল আর আকাশের এফেক্ট্টা যে কী দারুণ এসেছে যদি দেখতে তো বুঝতে। মারভেলাস। দেখে আমারও কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু চোখে জল আসার আগেই টাইম ওভার।"

সোমনাথবাবুর মিতলির দুষ্টু-দুষ্টু মুখের দিকে তাকিয়ে হো-হো করে খুব এক-চোট হেসে নিয়ে বললেন, "তার মানে শুধু কাঁদলেই হয় না, কান্নাটা টাইমলি হওয়া চাই, এই তো?"

"তা নয়তো কী! দেখলে না স্রেফ কান্নার টাইমিংয়ের জোরে কেমন জিতে গেল দেবারতি। বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত মিতলি জড়িয়ে ধরল তিতলিকে। তিতলি লজ্জা-লজ্জা মুখ করে চুপি-চুপি গলায় ডাকল, "দিদি!"

ওদের দেখতে দেখতে তিতলির ভাল নাম যে দেবারতি, সোমনাথবাবু সেকথা যেন ভুলেই গেলেন। তাঁর মনে হল, মিতলি আর তিতলি তাঁর দুটি মেয়েই ভারী ভাল, দুজনেই আজ ফার্স্ট।

ছবি অনুপ রায়

ঝড়-তুফানের রাজা

সুনন্দা দাশগুপ্ত

শীতের দিনে বরফে ঢাকা তুন্দ্রা অঞ্চল সাদায় সাদা হয়ে যায়। আর তার সঙ্গে চলে দুরন্ত বরফের ঝড়! শীতে যেন হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি লাগে। এ অঞ্চলে মানুষের মস্ত বড় বন্ধু পোষা কুকুর আর বলগা হরিণ। যাতায়াতের একমাত্র যান স্লেজগাড়ির বাহক ওরা।

অনেক অনেকদিন আগে, এক যাযাবর দলের তাঁবু পড়ল এই তুন্দ্রা অঞ্চলে। চামড়ার তৈরি এইসব তাঁবুকে বলে 'ছুম'। এই দলে ছিল এক বুড়ো। খুব গরিব। তিন মেয়ে তার। তিনটি মেয়েই সুন্দরী। কিন্তু সব-সেরা ছিল ছোট মেয়ে। খুব বুদ্ধিমতী আর দয়ালু।

সেবার পর পর কদিন চলল দারুণ বরফের ঝড়। সে কী শোঁ-শোঁ করে বাতাসের গর্জন আর কুচো কুচো বরফের বৃষ্টি। কেউ আর ছুম থেকে বার হতে পারে না। হাড় কাঁপানো শীতে আর শিকারেও বেরোতে পারে না কেউ। বেচারা গরিব বুড়োর তাঁবুতে আবার বড়-বড় ফুটো। গরম কাপড়চোপড়ও খুব বেশি নেই যে ভাল করে ঢাকাঢুকি দেবে। জ্বালানিরও অনটন—রাতে শোবার সময় তাঁবুর আগুন নিভিয়ে শুতে হয় তাদের।

একদিন, দুদিন, তিনদিন কাটল এই-ভাবে। না খাওয়া-দাওয়া। না জ্বালানি। শীতে যেন সর্বশরীর হিম হয়ে যাচ্ছে। হাওয়ার গজরানি বেড়েই চলেছে। বরফঝড়েরও বিরাম নেই। তাই তো! কী করা যায়! ভাবতে ভাবতে বুড়োর মনে হল—ঝড়তুফানের রাজা কোটুরা বোধহয় কোনো কারণে রাগ করেছেন। তাই এই বরফঝড়। তা হবেই তো! একা একা কত অসুবিধে তাঁর। আসলে তাঁর একটি ভাল বউ দরকার। এখন, আমাদেরই উদ্যোগ করে বউ পাঠাতে হবে। তবে যদি তাঁর রাগ পড়ে।

বড় মেয়েকে ডেকে বুড়ো বলল, "মা,

সর্দিতে একটি দিনও বৃথা না যায়

সর্দির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়া যায়

সর্দির যে সব লক্ষণ সুন্দর দিনগুলোকে একেবারে মাটি করে দেয়, যেমন—নাক থেকে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা ভার, গলা খারাপ, বুকে সর্দি বসা—তা থেকে আরাম পাবার উপায় আছে।

সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়ে সর্দি থামান

যেকোনো অসুখের মত চিকিৎসা করলেই যথেষ্ট নয়। সর্দির বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করুন যা একই সঙ্গে শরীরের সমস্ত আক্রান্ত অংশে কাজ করে।

কোল্ডরিন শুধু সর্দির জন্যেই

কোল্ডরিন সর্দির যাবতীয় কষ্টকর লক্ষণ থেকে আরাম দেয়। এর বিশেষ উপাদানগুলি সর্দিতে আক্রান্ত সমস্ত অংশে একই সঙ্গে কাজ করে। তাছাড়া, এতে যে ভিটামিন 'সি' আছে তা আপনাকে সর্দি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যোগায়। সর্দি হলে, তার চিকিৎসা সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়েই তো করা উচিত!

কোল্ডরিন

সর্দির জন্যে সর্দির বিশেষ ওষুধ

CASBC-64-192 BN

তুমিই তবে কোটুরার কাছে যাও। তাঁর ঘর করো গিয়ে। তাঁর কাছে ঝড় থামাবার আরজি জানাও। না হলে যে সবাই মরব।"

পথের হদিসও বলে দিল বুড়ো—"যেদিক থেকে ঝড় আসছে, সেদিকে এগিয়ে যাও। দেখবে, এমনি হাওয়ার জোর যে বারবার তোমার আংরাখা খুলে যাবে। জুতোর মধ্যে বরফ ঢুকে যাবে। কিন্তু এসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামিও না। একবারও না থেমে, একটানা এগিয়ে গিয়ে, উঠবে এক উঁচু পাহাড়ের মাথায়। তারপর তোমার স্লেজ সোজা গিয়ে থামবে পাহাড়ের ওপারে, কোটুরার তাঁবুর দোরগোড়াটিতে। ভেতরে ঢুকে, সাবধানে এক-পাশে বসে থাকবে। কোনো কিছু ছোঁবে না। কোটুরা এসে যা করতে বলবেন, তাই করবে।"

ভাল করে ঢাকাচাপা দিয়ে স্লেজে চড়ে বসল বড় মেয়ে। দমকা হাওয়া তাকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গেল অনেক দূরে! কিন্তু কী মুশকিল। বারবার আংরাখার ফিতে খুলে যায়। জুতোয় বরফ ঢুকে যায় বারবার।

শেষে স্লেজ এসে পৌঁছল বিশাল এক তাঁবুর সামনে। বড় মেয়ে তড়বড়িয়ে ছুমের মধ্যে ঢুকেই দেখল, ঝলসানো হরিণের মাংসের মস্ত এক চাঙড় ঝুলছে। জিভে জল এল তার। ভাবল, একটুখানি দেখিই না চেখে! তারপর চাখতে চাখতে, বেশ কিছুটা মাংস খেয়ে ফেলল সে। এমন সময় শিকার সেরে হাজির স্বয়ং মহারাজ কোটুরা।

"কী গো মেয়ে! কী চাও তুমি?" কোটুরা জিজ্ঞেস করলেন।

বড় মেয়ে বলল, "আপনার রানী হওয়ার জন্য বাবা আমায় পাঠিয়েছেন।"

কোটুরা বললেন, "তা বেশ তো! এখন রাঁধো দিকিনি ভাল করে আজকের শিকারের মাংস।"

রান্না হলে কোটুরা মাংস দুভাগ করে বললেন, "এই একভাগ রইল তোমার আর আমার। বাকি অর্ধেক এই খুণ্ডেপোষে ঢেলে নাও। পাশের 'ছুমে' দিয়ে এসো। ভালমন্দ খাবারদাবার পড়শিদের সঙ্গে ভাগ করে খেতে হয়।"

বাইরে তখন ঠাণ্ডা বাতাস ছুঁচ ফোটাচ্ছে। পেঁজা তুলোর মতো বরফ ঝরছে সমানে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। খানিক দূর গেল

বড় মেয়ে। একটু দাঁড়াল। তারপর খাবারটুকু মাটিতে ফেলে দিয়ে ফিরে এল। খুব অবাক হলেন কোটুরা, "এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে! দেখি, এর বদলে পড়শিরা কী দিল?"

বড় মেয়ে অম্লানবদনে বলল, "নাঃ! কিচ্ছুটি দেয়নি!"

পরদিন, শিকারে বেরোবার আগে, কোটুরা একরাশ চামড়া দিলেন বড় মেয়েকে। বললেন, সে যেন একপ্রস্থ পোশাক তৈরি করে রাখে। সন্ধেবেলা ফিরে এসে তিনি পরবেন।

কী মুশকিল! না আছে সেলাইয়ের জিনিস, না কাজের লোক। তবু, খুব মন দিয়ে কাজ শুরু করল বড় মেয়ে। এমন সময়, এসে হাজির এক বুড়ি। বুড়ির চোখে কুটো পড়েছে, বার করে দিতে হবে।

"এখন সরে পড়ো তো বাপু। আমার বলে মরবার সময়টুকু নেই"—ঝাঁঝিয়ে উঠল বড় মেয়ে। চলে গেল বুড়ি। সারাদিন খাটার পরে পোশাক একটা তৈরি হল। কিন্তু সে পোশাকের কোনও ছিরিছাঁদ নেই। কোটুরার গায়েও ছোট হল। ভীষণ রেগে গিয়ে, কোটুরা বড় মেয়েকে ছুঁড়ে ফেলল অনেক দূরের প্রান্তরে। সেখানে ঠান্ডায় জমে একেবারে বরফ হয়ে সে মিশে গেল বরফের স্তূপে।

দিনের পর দিন যায়। বেড়েই চলেছে ঝড়তুফান। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো গন্ডগোল হয়েছে মনে করে, বুড়ো এবার মেজ মেয়েকে পাঠাল কোটুরার কাছে। কী কী করতে হবে বলে দিল বারবার। কিন্তু মেজ মেয়েও নির্বোধের মতো, বড় মেয়ে যা করেছিল, তাই করল। তুন্দ্রার বরফের রাশির মধ্যে মিশে গেল মেজ মেয়ে। দুর্যোগ চলতেই থাকল সমানে। অবশেষে বুড়ো তার ছোট মেয়েকে পাঠাল কোটুরার কাছে—"দেখিস মা! ঠিক যেমনটি বলেছি, তেমনটি করবি। তুই ছাড়া এখন আর কেউ নেই আমার তবু তোকে পাঠাচ্ছি। যদি তুই কিছু করতে পারিস, তবেই দলের লোকেরা বাঁচবে। নইলে, এই সাংঘাতিক বরফ-ঝড়ে কারও আর নিস্তার নেই।"

বিদায় নিল ছোট মেয়ে। হাওয়ায় হাওয়ায় এগিয়ে চলল স্লেজ। বারবার আংরাখা খুলে গেল। জুতো ভিজে গেল বরফে। কিন্তু একটুও না থেমে ছোট মেয়ে সমানে এগিয়ে গেল সেই উঁচু পাহাড়ের চুড়োয়। তারপরে পৌঁছল কোটুরার 'ছুমে'। কোনও কিছুতে হাত দিল না। চুপটি করে একপাশে বসে রইল সে। কোটুরা এলে ছোট মেয়ে বলল, "আপনি দয়া করে এই তুষারঝড় থেকে সকলকে বাঁচান।"

কোটুরার কথামতো সুস্বাদু করে মাংস রাঁধল ছোট মেয়ে। যথারীতি কোটুরা তার অর্ধেক পড়শিকে দিয়ে আসতে বললেন।

ঘোর অন্ধকারে বেরিয়ে ছোট মেয়ে ভাবছে, অচেনা জায়গা। কতদূরে না জানি যেতে হবে। কিছুই তো চোখে পড়ছে না। এমন সময়, কী আশ্চর্য! একটা ছোট্ট পাখি উড়ে এসে পথ দেখিয়ে দিল। ছোট মেয়ে উপস্থিত হল দূরের একটা 'ছুমে'। ছুমের মালিক এক বুড়িমা। তিনি খুব খুশি হয়ে খাবার নিলেন। তারপর, বারকোশ ভরে উপহার দিলেন নানা-রকম ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ, আরও কত কিছু। উপহার পেয়ে কোটুরা তো মহাখুশি।

পরদিন, কোটুরা ছোট মেয়েকেও একটা চামড়ার পোশাক তৈরি করতে বললেন। সন্ধে-বেলা পরবেন। বুড়িমার উপহার খুব কাজে লাগল। একমনে ছোট মেয়ে কাজ করছে। এমন সময় সেই বুড়িমা এসে বললেন, "বাছা! চোখে বালি ঢুকে গেছে, বার করে দেবে?" ছোট মেয়ে যত্ন করে বালিটা বার করে দিল। তখনই দেখতে পেল, বুড়ির কানের মধ্যে গুটিশুটি হয়ে বসে আছে এক মেয়ে। বুড়ি বলল, "একজন না, ওরা চারজন আছে।"

বুড়ি ডাকতে, সবাই বেরিয়ে এল। তার-পর, সকলে মিলে সুন্দর, নরম এক পোশাক কেটেছেঁটে, সেলাই করে ফেলল। দেখার মতো হল সে পোশাক। মাপে একেবারে ঠিক হল কোটুরার।

খুশি হয়ে কোটুরা ছোট মেয়েকে বললেন, "তুমি ভারী সাহসী, লক্ষ্মী আর কাজের মেয়ে। অন্যদের মতো স্বার্থপর নও। আমার মা আর বোনেদেরও খুব পছন্দ হয়েছে তোমাকে। তাই সবাই তোমায় সাহায্য করেছে। তোমার জন্যই তোমার জাতভাইরা বেঁচে গেল এবার। এখন থেকে আমার রানী হয়ে তুমি আমার ছুমে থাকবে।"

তক্ষুনি ঝড় থামল। ঝলমলে রোদে আলো হল চারদিক। **(রুশ রূপকথা)**

ছবি মাখন দত্তগুপ্ত

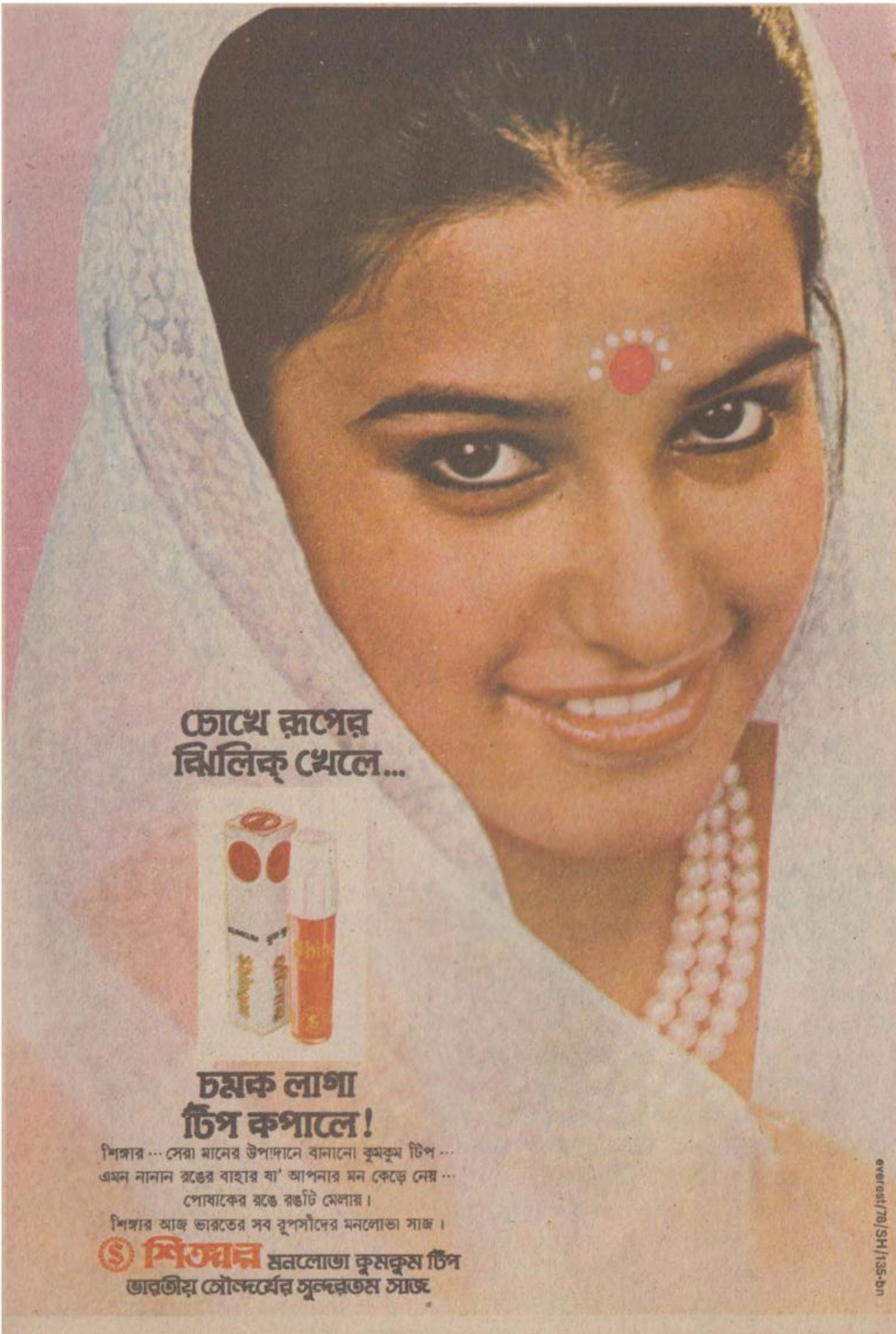
চোখে রূপের
ঝিলিক্ খেলে...
চমক লাগা
টিপ কপালে!
শিঙ্গার ... সেরা মানের উপাদানে বানানো কুমকুম টিপ ...
এমন নানান রঙের বাহার যা' আপনার মন কেড়ে নেয় ...
পোষাকের রঙে রঙটি মেলায়।
শিঙ্গার আজ ভারতের সব রূপসীদের মনলোভা সাজ।
শিঙ্গার মনলোভা কুমকুম টিপ
ভারতীয় সৌন্দর্যের সুন্দরতম সাজ
everest/78/SH/135-bn

প্রোফেসর ক্যালকুলাস

সেদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় প্রোফেসর ক্যালকুলাসের সঙ্গে দেখা। আমি বললাম, "হ্যালো প্রোফেসর, কোথায় চললেন?"

তিনি একটু হেসে বললেন, "ভালই আছি।"

আমি বললাম, "আপনি কি খুব ব্যস্ত?"

তিনি বললেন, "আরে না না, এখন ভীষণ ব্যস্ত।" এই বলে হাতের দোলকটিকে "আরও দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে" বলে দোলাতে দোলাতে চলে গেলেন।

রিঙ্কু সরকার (বয়স ৯)

ছবি এঁকেছে **সুনন্দ বাগচী** (বয়স ৪)

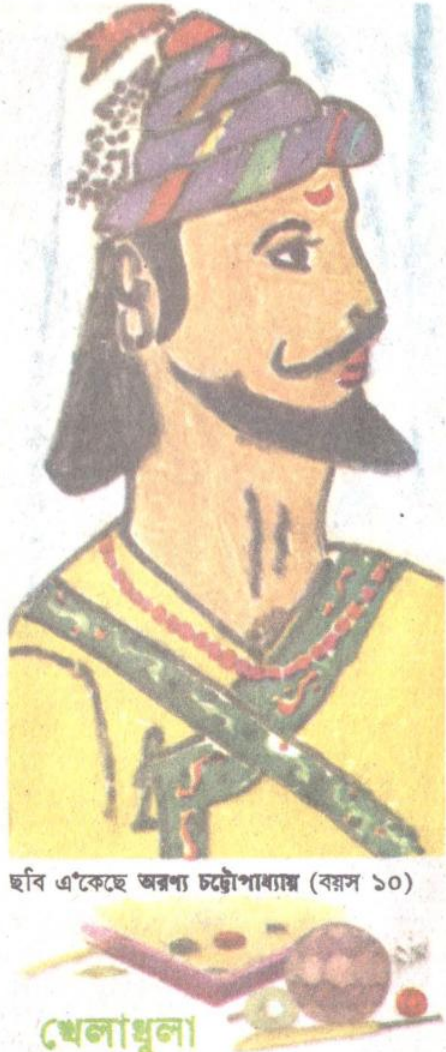

ছবি এঁকেছে **অরণ্য চট্টোপাধ্যায়** (বয়স ১০)

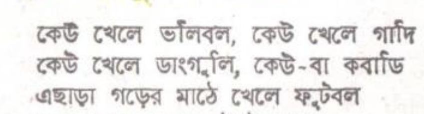

খেলাধুলা

কেউ খেলে ভলিবল, কেউ খেলে গাদি
কেউ খেলে ডাংগুলি, কেউ-বা কবাডি
এছাড়া গড়ের মাঠে খেলে ফুটবল
মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল
কলেজে টেনিস খেলা, বাড়িতে ক্যারাম
ক্লাবে ক্লাবে খো-খো আর নিত্য ব্যায়াম
ছোট্টরা চালে পুট ছক্কা লুডোয়
কেউবা ভূতলশায়ী কুস্তি-জুডোয়
শীতকালে ইডেনেতে মারে চার-ছয়
বল যদি ফসকায় দুর্গতি হয়।

ঝুমকা ভাদুড়ী (বয়স ১৪)

ছোটদের যত সেরা বই

সুবোধ ঘোষ একটি নতুন ধরনের কাহিনীসমৃদ্ধ কিশোর-উপন্যাস লিখেছেন, সে-উপন্যাসের নাম 'সেই অদ্ভুত অভ্রখনি।' এর পটভূমি কোডারমা-গিরিডি অঞ্চল। শালের জঙ্গলের মধ্যে এক অভ্রখনি, সেই অভ্রখনিতে ভাগ্য পরীক্ষা করতে এল অদ্ভুত প্রকৃতির এক মানুষ। একদম একা। এল ঠিক তখনই, যখন দারুণ-রকমের এক আতঙ্কে লোকজন সবাই পালিয়ে যাচ্ছে খনি-এলাকা ছেড়ে। অথচ হর্ষনাথ নামের সেই মানুষটি ওখানেই ইজারা নিল এক কুখ্যাত অপয়া খাদের। সেই অদ্ভুত মানুষ আর আশ্চর্য অভ্ররাজ্য নিয়ে এক দারুণ আকর্ষক কাহিনী 'সেই অদ্ভুত অভ্রখনি।'

সমরেশ বসু মুখ্যত বড়োদের লেখক রূপেই পরিচিত। কিন্তু ছোটদের মহলেও তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যে-দুটি দুর্ধর্ষ কিশোর-উপন্যাস লিখেছেন তিনি তার একটি—'মোক্তারদাদুর কেতুবধ।' সুরথ নামে একটি ছোট্ট ছেলের বিচিত্র কাণ্ডকারখানা নিয়ে লেখা এই উপন্যাসে গ্রামজীবনের এক আশ্চর্য ছবি ফুটে উঠেছে। অন্যটি, 'বন্ধ ঘরের আওয়াজ', রহস্য-অ্যাডভেনচার কাহিনী। একটি ছোট্ট ছেলে নিখোঁজ হল, তাকে খুঁজতে গিয়ে আরেকটি ছেলে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল বন্ধ ফ্ল্যাটবাড়ির ভিতরে। তারপর? তারপর থেকেই শুরু এক দারুণ রোমাঞ্চকর কাহিনীর।

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর আমাদের নিবেদিতা ৬ মৌমাছির রাজার রাজা ৭ **সরলাবালা সরকারের** পিনকুর ডাইরি ৩ **সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের** ছেলেদের বিবেকানন্দ ২ **পাপু (সুব্রত সরকার)র** পাপুর বই ৬ পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫ **পার্থসারথি চক্রবর্তীর** কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা ৪ রসায়নের ভেল্কি ৩ ম্যাজিকের মতো মজা ৫ তত সহজ ছিল না ৫ **সুকুমার রায়ের** সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ১ম ২৫ ২য় ৩০ জীবজন্তু ৮ সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০ **বুদ্ধদেব গুহর** ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫ মউলির রাত ৫ **ননীগোপাল চক্রবর্তীর** চরকাবুড়ি ৪ যাদুঘরে চল যাই ৬ **মতি নন্দীর** ননীদা নট আউট ৫ স্ট্রাইকার ৬ স্টপার ১০ কোনি ৭ **বিমল করের** ওআণ্ডার মামা ৬ কাপালিকরা এখনও আছে ৭ রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য ১০ **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিমল দাসের** সাদা বাঘ ১০ **অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর** শাদা ঘোড়া ৮ **অজেয় রায়ের** ফেরোমন ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬ **গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও মন্মথ চৌধুরীর** নিশীথ রাতের আহ্বান ৩ **গৌরকিশোর ঘোষের** দুষ্টুর দুপুর ৪ **আনন্দ বাগচীর** বনের খাঁচায় ৬ **মনোজ বসুর** ওস্তাদ নটবর ৬ **শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক ৪ **শৈলেন ঘোষের** অরুণ বরুণ কিরণমালা ৪ মিতুল নামে পুতুলটি ৫ ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬ বাজনা ৬ হুপোকে নিয়ে গপ্পো ৫ আমার নাম টায়রা ৫ আজব বাঘের আজগুবি ৭ **হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের** ভয়ের মুখোশ ৬ পাথরের চোখ ৬ সীমানা ছাড়িয়ে ৬ পাঁচ মুণ্ডির আসর ৭ **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের** ভূমিকম্পের পটভূমি ৪ **ইন্দ্রমিত্রের** বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৬ শরৎ কথামালা ১০ **সত্যজিৎ রায়ের** প্রোফেসর শঙ্কুর আজব অ্যাডভেনচার: প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৬ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬ মহাসংকটে শঙ্কু ৬ **পূর্ণেন্দু পত্রীর** কী করে কলকাতা হলো ৫ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪ **সুবোধ ঘোষের** সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৫ **সমরেশ বসুর** মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৬ **শিশির করের** গঙ্গায় বাঘ ৪ **লীলা মজুমদারের** বাতাসবাড়ি ৫ **অমরনাথ রায়ের** দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী ১০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

দারোয়ান

দারোয়ান দারোয়ান
যাবি নাকি কার্শিয়াং?
দারোয়ানের মাথায় টুপি
দারোয়ানকে ধরে কুপি।

ছবি ও ছড়া তিতি চট্টোপাধ্যায় (বয়স ৯)

প্রিয় খাবার

ভালবাসি খেতে আমি
ঝাল-ঝাল লঙ্কা,
লঙ্কা কিনতে হলে
ছ'ুড়ে দাও টঙ্কা।
চকোলেট খেতে
ভালবাসেন আমার মা,
মেজাজ তাঁর ঠিক থাকবে না,
দিলেই যা-তা।
বাবার খাবার নিয়ে
নেই কোনো বালাই,
যাই দাও, তিনি বলবেন
''দাও আরও খাই।''
সীতা মুখোপাধ্যায় (বয়স ১২)

ছবি এ'কেছে সুমন বসু (বয়স ৮)

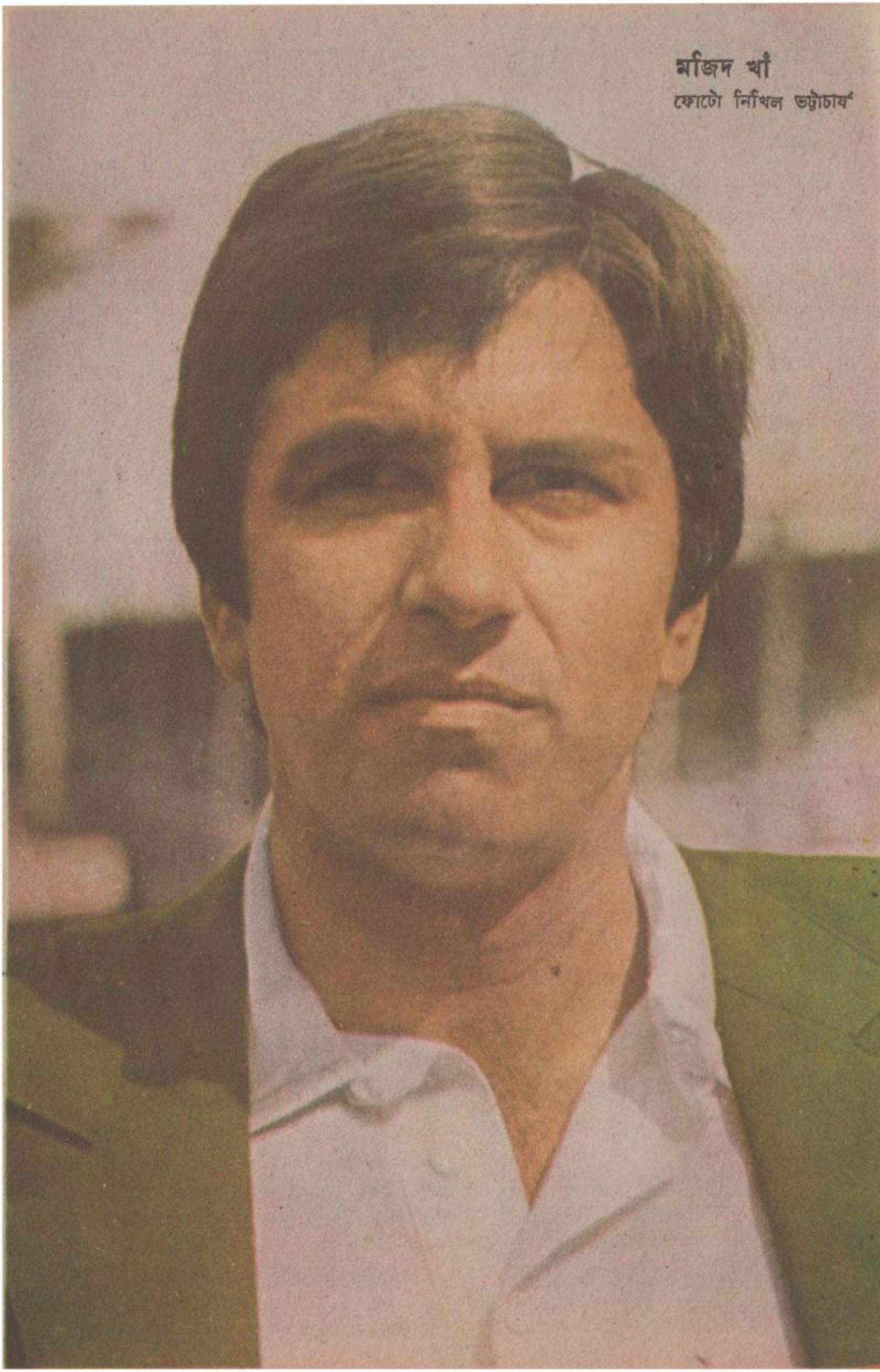

মজিদ খাঁ
ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

ইনিংস গড়ার কারিগর

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

দশ বছর আগের কথা। ইংল্যাণ্ডের কাউণ্টি ক্রিকেট লীগে গ্ল্যামরগান খেলছে উরস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে। জিতলেই চ্যাম্পিয়নশিপ—দীর্ঘ একুশটি বছর পরে। গ্ল্যামরগানের একটি উইকেট পড়ল। পরের ব্যাটসম্যান কোথায়? না, ড্রেসিং রুমের এককোণে দু'হাত দিয়ে ব্যাটটাকে মেঝেয় দাঁড় করিয়ে হ্যাণ্ডেলে মাথার ভর দিয়ে ঝিমোচ্ছেন। ঝাঁকুনি দিয়ে ডেকে তুলতে হল। তারপর তাঁর সে কী খেলা! বেশি নয়, ১৫৬ রান করলেন। জিত, লীগ সবই হল। আর ব্যাটসম্যানটি ব্যক্তিগতভাবে লাঞ্চের আগেই সেঞ্চুরি (১১৪) করলেন।

দারুণ কৃতিত্বের ব্যাপার, সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্রিকেট-জগতের জন্যে আরও চমক অপেক্ষা করছিল। সাত বছর বাদে ঐ ব্যাটসম্যানটিই আবার লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি করলেন—এবার টেস্টে। প্রথম দিনেই। টেস্টের (তখন পর্যন্ত) নিরানব্বই বছরের ইতিহাসে এই কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন শুধু ভিক্টর ট্রাম্পার, চার্লস ম্যাকার্টনি আর ডন ব্র্যাডম্যান।

নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে, ব্যাটসম্যানটি পাকিস্তানের বিশ্বখ্যাত ওপনার মজিদ জাহাঙ্গির খাঁ, ভারত-সফরকারী পাকিস্তান দলের সহ-অধিনায়ক। আর টেস্টটি ১৯৭৬ সালে করাচিতে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের তৃতীয় টেস্ট।

সহ-অধিনায়ক কেন, মজিদ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশের অধিনায়কত্বও করেছেন। আর যে গ্ল্যামরগান কাউণ্টিতে তিনি বহুদিন খেলেছেন, সেখানেও অধিনায়ক হয়েছিলেন। মতান্তর হওয়ায় পদ, দল সবই ছেড়ে দেন।

পনেরো বছর বয়সে লাহোর 'বি' দলের হয়ে জীবনের প্রথম ফার্স্টক্লাস ম্যাচটিতেই মজিদ জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আসছেন এবং থাকবেন। তাঁর স্কোর ছিল ১১১ নট আউট আর ৬৭। তিন বছর পর মজিদ খাঁকে প্রথম দেখা গেল টেস্টের (১৯৬৪-৬৫ সিরিজ) আসরে ঐ করাচিতেই। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে।

এবারে ভারতে আসার আগে পর্যন্ত ৪৪টি

ঘুমন্ত জাহির। মাঠে নেমে বোলারের ঘুম কাড়বেন

টেস্ট খেলেছেন মজিদ। সংগ্রহ সাতটি সেঞ্চুরি সমেত ৩,১৪০ রান (গড় ৪২·৪৩)। অফ-স্পিন বোলার মজিদের টেস্ট উইকেট প্রাপ্তিও নেহাত কম নয়—চব্বিশটি, উইকেট-পিছু ৪৬·৫৮ রান দিয়ে। টেস্টে সর্বোচ্চ রান ১৬৭ আর সবচেয়ে ভাল বোলিং ৪৫ রানে ৪ উইকেট। মজার ব্যাপার, মজিদ এই দুটিই করেছেন একই টেস্টে—১৯৭৬-৭৭ সিরিজে জর্জটাউনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে। ব্যাটিং ও বোলিং দুইই ডান হাতে করেন মজিদ। আর প্রথম স্তরের স্লিপ ফীল্ডসম্যান মজিদ টেস্টে এ-যাবৎ ক্যাচ ধরেছেন ৫৪টি—যেটা পাকিস্তানের রেকর্ড। এর উপর তিনি উইকেটকীপিংয়েও পটু, টেস্টেও করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এমন খেলোয়াড়কে ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেটে নিতে প্যাকার দেরি করেননি।

মজিদের এক কাকা একবার বলেছিলেন, "আগে একটা ডিগ্রী করে ফেল।" কথাটা মজিদ ভোলেননি। তাই কাউণ্টি ক্রিকেট খেলতে খেলতেই তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে ট্রাইপস হন। কেম্ব্রিজ 'ব্লু' তো হয়েছেনই। ১৯৭০ সালে মজিদ 'উইজডেন'-এর পাঁচ 'ক্রিকেটার অব দা ইয়ার'-এর অন্যতম মনোনীত হন, যে-সম্মান যে-কোনও ক্রিকেটারেরই কাম্য।

১৯৭৫ সালে ট্রেন্টব্রিজে প্রুডেন্সিয়াল বিশ্বকাপে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১০১-ই বোধ

হয় মজিদের শ্রেষ্ঠ ইনিংস। এখন মজিদ পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজে দায়িত্ব-পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত।

এবার আর-একজন ব্যাটসম্যানের কথা বলি। ডাবল সেঞ্চুরি স্পেশালিস্ট। কে? কনটাক্ট-লেন্স-পরা তিন নম্বর ব্যাটসম্যান সৈয়দ জাহির আব্বাস। টেস্টে ছটি সেঞ্চুরি করেছেন তার তিনটি ডাবল। তাছাড়া জাহিরের এক অনন্য কৃতিত্ব আছে। তিনটি ফার্স্ট-ক্লাস খেলার প্রতিটিতে দু-ইনিংসেই অপরাজিত সেঞ্চুরি (প্রথম ইনিংসে ডাবল)! ১৯৭৬ সালে সারের বিরুদ্ধে ২১৬, ১৫৬, আর কেন্টের বিরুদ্ধে ২৩০, ১০৪। পরের বছর সাসেক্সের বিরুদ্ধে ২০৫, ১০৮। ফার্স্টক্লাস খেলায় এ-পর্যন্ত মরসুমে হাজারের বেশি রান করেছেন এগারোবার। সাতবার দেশে, চারবার বিদেশে। মোট একুশ হাজারের বেশি। এই তো এই বছরই জাহির তাঁর কাউন্টি গ্লস্টারশায়ারের হয়ে ১৬টি ম্যাচে ১১৯২ রান করেছেন। জাহির যত বড় খেলোয়াড়, সে তুলনায় তাঁর টেস্টের রান এমন কিছু নয়—১৯৬৯-এ নিউ-জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট থেকে এ পর্যন্ত ৩৩ টেস্টে ২,৪৬০ (গড় ৪৩·৯২)। বলও করেন। ১৯৭৫-৭৬ সালে লাহোরের দাউদ ক্লাবের হয়ে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে ১৫ রানে ৫ উইকেট তাঁর জীবনের সেরা বোলিং। অবশ্য টেস্ট উইকেট পাননি এখনও। টেস্টে জাহিরের সর্বোচ্চ স্কোর ২৭৪—ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে (১৯৭১) বার্মিংহামে। ক্যাচ ধরেছেন ২০টি।

অতি উঁচুদরের ও স্টাইলিস্ট স্ট্রোক-প্লেয়ার জাহির যে-কোনও বোলারের কাছে বিভীষিকা। এই জন্যেই তো দ্বিতীয় বিশ্ব-কাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রবার্টস, হোল্ডিং, ক্রফট ও গার্নারকে খেলে ৯৩ করেছিলেন জাহির। জাহিরের শক্তি বিশেষত লেগের দিকেই, যদিও অফে বহুরকমের মার মারতে তিনি সিদ্ধহস্ত। পেস বোলারদের হুক করতে গিয়ে যদি অল্প রানের মাথায় জাহির আউট হয়ে যান, তাহলে এক কথা, না হলে বিপক্ষের বিপদ। কারণ একবার হাত জমে গেলে জাহির প্যাভিলিয়নে ফেরার রাস্তা ভুলে যাবেন। স্বয়ং ইয়ান চ্যাপেল একথা বলেছেন। জাহিরও উইজডেনের সম্মান পেয়েছেন।

মজিদ ও জাহিরের মধ্যে মিল প্রচুর। পি আই এ-র এই দুই খেলোয়াড়ই ডান-হাতি ব্যাটসম্যান ও অফ-ব্রেক বোলার। দুজনেরই বিদেশে বিশেষত ইংল্যান্ডে প্রচুর নাম। জাহিরের মতো মজিদও কনটাক্ট-লেন্স পরে কিছুদিন খেলেছিলেন। দুজনেই (দক্ষিণ আফ্রিকা বাদে) সব দেশের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেছেন। দুজনেই প্রথম টেস্ট খেলেছেন করাচিতে। বয়সের দিক থেকে দুজনেই প্রায় সমান। মজিদের জন্ম ১৯৪৬-এর ২৮ সেপ্টেম্বর, জাহিরের ১৯৪৭-এর ২৪ জুলাই। জন্মস্থান দুজনেরই অবিভক্ত ভারতে—মজিদের জলন্ধর, জাহিরের শিয়ালকোট। মজিদের বাবা ডাঃ জাহাঙ্গির খাঁ ভারতের হয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেছেন ১৯৩২ ও ১৯৩৬ সালে। ইমরান সম্পর্কে মজিদের ভাই। সবচেয়ে বড় কথা মজিদ-জাহির ছাড়া পাকিস্তানের চলে না। ১৯৭৮ সালে ইংল্যান্ডে পরপর দুটি টেস্টে ইনিংসে হেরে পাকিস্তান তা বুঝেছে। এবার বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হারলেও যে ২৫০ রান পাকিস্তান করেছে, তার ১৭৪ এসেছে এই দুজনের ব্যাট থেকে।

আসলে দুজনেই ইনিংস গড়ার কারিগর।

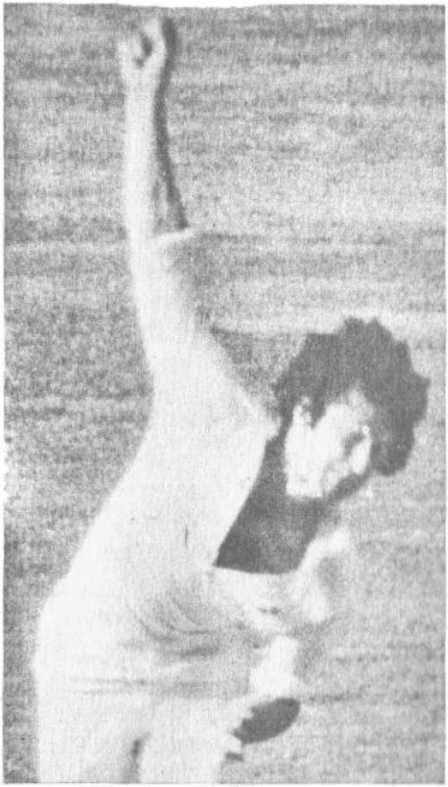

বল করছেন ইমরান। রজার বিনি হুক করে সেই বল বাউন্ডারিতে পাঠিয়েছেন ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

ঠাণ্ডা লড়াই

অভিমন্যু

আনন্দমেলার গত সংখ্যাতেই ভারত-পাক প্রথম টেস্ট ড্র হওয়ার খবর তোমরা জেনে গেছ। এবার সে-সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা। আঠেরো বছর পর পাকিস্তান ক্রিকেট দল ভারত সফরে এসেছে। অতএব প্রথম টেস্টকে ঘিরে বাঙ্গালোরে উৎসাহের অভাব ছিল না। কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার স্টেডিয়াম প্রতিদিনই ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। কিন্তু আফশোসের বিষয়, খেলা দেখে দর্শকদের মন ভরেনি।

প্রথম টেস্ট যে জমে ওঠেনি তার জন্য নিষ্প্রাণ পিচকে দায়ী করা যেতে পারে অনেকখানি। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, ভারত ম্যাচ হেরে যেতে পারে এই আশঙ্কায় ভারতীয় উইকেটগুলিকে প্রায়ই এমনভাবে তৈরি করা হয় যে, ব্যাট-বলের লড়াই তেমন জমে না। ব্যাটসম্যানেরা খোশমেজাজে ব্যাট চালাতে পারেন না। বোলাররা উইকেট থেকে তেমন সাহায্য পান না। বাঙ্গালোর পিচের চরিত্র ছিল এই রকমই। বৃষ্টি এসে প্রায় ছ ঘণ্টার মতো খেলা বানচাল করে না দিলেও এই টেস্ট ড্র-ই হত।

ভারতের মাটিতে পা দিয়েই পাক অধিনায়ক আসিফ ইকবাল রিজভি ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর দল আকর্ষণীয় ক্রিকেট উপহার দেবে। বর্তমান পাকিস্তান ক্রিকেট দলটি ব্যাটিংয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী এবং মজিদ খান, জাহির আব্বাস, জাভেদ মিয়াঁদাদ, ওয়াসিম রাজা, আসিফ ইকবাল, ইমরান খানেরা বেশ পিটিয়ে খেলেন বলে সুনাম আছে। কিন্তু বাঙ্গালোরে আসিফ এবং অন্যান্যদের নিজ মূর্তিতে দেখা গেল না।

যদিও পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে বেশ ভাল রান করেছে (৪৩১ রানে ৯ উইকেট, এই অবস্থায় আসিফ ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন)। জাহির, মিয়াঁদাদ, মুদাসসার নাজার, আসিফ এবং ওয়াসিম রাজার ব্যাট থেকে বেশ কিছু চোস্ত মার এসেছে (বিশেষ করে জাহিরের একটি কভার ড্রাইভের তো তুলনা হয় না), কিন্তু রান তোলার গতি ছিল মন্থর। পাক ব্যাটসম্যানেরা ভারতীয় বোলারদের ওপর মোটেই প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। ওপেনিং ব্যাটসম্যান মুদাস্সার নাজার সেঞ্চুরি না করলে পাকিস্তানের ইনিংস হয়ত বেশ অল্প রানেই শেষ হয়ে যেত।

ভারতের চেতন চৌহানের মতো মুদাস্সর মোটেই স্ট্রোক প্লেয়ার নন, কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দলের জন্য শক্ত হাতে ব্যাট ধরতে পারেন। দু বছর আগে লাহোরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এমনই একটা ইনিংস খেলেছিলেন মুদাস্সার। তাঁর ৫৫৭ মিনিটে শতরান (১১৪) আজও টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে দীর্ঘতম সময়ের শতরান বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

বাঙ্গালোরে সেই মুদাস্সার করলেন ১২৬। এই ইনিংসে ড্রাইভ, কাট, পুলের ঘটা ছিল না, কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে এই সেঞ্চুরি ছিল অমূল্য, তবে মুদাস্সার নিশ্চয় ভাগ্যবান, মাত্র ১৭ রানের মাথায় কপিলদেবের বলে শিবলাল যাদবের হাতে সহজ ক্যাচ তুলে উনি রেহাই পান। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—"ক্যাচেস উইন দি ম্যাচেস"। যাদব ক্যাচটি ধরতে পারলে পাকিস্তান বেকায়দায় পড়ত। কারণ, অল্প রানে পাকিস্তান তাদের দুজন নামী ব্যাটসমান—মজিদ খান এবং জাহির আব্বাসের উইকেট খুইয়েছিল।

প্রথম টেস্টে মুদাস্সারের সেঞ্চুরি তাঁকে একটি দুর্লভ সম্মানের অধিকারী করেছে। মুদাস্সারের বাবা নাজার মহম্মদ প্রথম পাকিস্তানী ক্রিকেটার, যিনি ভারতের বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন ১৯৫২-৫৩ লক্ষ্ণৌ টেস্টে। একই দেশের বিরুদ্ধে বাবা এবং ছেলের সেঞ্চুরি একটি বিরল ঘটনা।

পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে ভাল রান করেছেন জাহির(৪০); মিয়াঁদাদ (৭৬); রাজা (৩৬); আসিফ (৫৫) এবং ওয়াসিম বারি (৪৯ নট আউট)। শেষের দিকে ওয়াসিম বারি শক্ত হাতে ব্যাট না ধরলে পাকিস্তানের পক্ষে চারশো রান অতিক্রম করা সম্ভব হত না।

অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন যে, ভারতের নতুন স্পিন জুড়ি দিলীপ দোশী এবং শিবলাল যাদব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মোটেই সুবিধা করতে পারবেন না, কিন্তু সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন দোশী। বাঙ্গালোর টেস্টে উনি সত্যি ভাল বল করেছেন। প্রথম ইনিংসে তিনটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে দুটির মধ্যে একটি উইকেট পেয়েছেন। ভাগ্য সহায়ক হলে এই ম্যাচে আরও উইকেট পেতেন দিলীপ দোশী। শিবলাল যাদব প্রথম দিকে তেমন ভাল বল করতে পারেননি, তবে শেষ পর্যন্ত নিজের লাইন ও লেংথ খুঁজে পান ও তিনটি উইকেট দখল করেন।

পাকিস্তানের বড় ইনিংসের জবাবে ভারতের সূচনা মোটেই সুবিধার হয়নি। মাত্র ১৭ রানে ভারত চেতন চৌহানের উইকেট হারায়, কিন্তু পরে সুনীল গাভাসকার (৮৮), গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ (৭৩), যশপাল শর্মা (৬২), নবাগত রজার বিন্নি (৪৬), কিরমানি (৩৭) এবং কপিলদেব (৩৮) ইনিংসকে মজবুত করেন। ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৪১৬ রানে। নাটকীয়ভাবে শেষ চারটি উইকেট মাত্র ছয় রানে না হারালে ভারত প্রথম ইনিংসে এগিয়ে যেতে পারত।

বাঙ্গালোরে গাভাসকার কখনোই বিশেষ সুবিধে করতে পারেন না। কিন্তু, এই টেস্টে উনি ভাল ব্যাট করবেন—এইরকম প্রতিজ্ঞা নিয়ে যেন মাঠে নেমেছিলেন। মাত্র ১২ রানের জন্য গাভাসকার তাঁর ২৩তম সেঞ্চুরি থেকে বঞ্চিত হন।

নিজের মাঠে আবার ভাল খেললেন বিশ্বনাথ। যশপালের জন্য ভারতীয় দলের পাঁচ নম্বর স্থানটি এখন পাকা। কিন্তু সত্যিই অবাক করেছেন রজার বিন্নি। যেভাবে উনি ব্যাট করেছেন (ইমরান খানকে হুক করে বাউন্ডারিতে বল পাঠাতেও পিছপা হননি), তাতে মনে হয়, এই তরুণ ক্রিকেটারের ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল।

দিল্লি টেস্ট ড্র

প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানের ২৭৩ রানের জবাবে ভারত মাত্র ১২৬ রান তোলে। দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তান তোলে ২৪২ রান। তখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, জয়ের জন্য যে ৩৯০ রান দরকার, ৫৫০ মিনিটে ভারত তা তুলতে পারবে কি না।

অনেকে বলেছিলেন, জয়ের কথা ভাবাই চলে না, ভারত এ-খেলায় হেরে যাবে। সত্যি বলতে কী সিকান্দর বখতের বলে ভারতের প্রথম ইনিংস যেভাবে শীতের পাতার মতো ঝরে গিয়েছিল (৬৯ রানে ৮ উইকেট) তাতে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত যে ওই ৫৫০ মিনিট টিঁকে থাকতে পারবে, এমন কথাও সহজে ভাবা যায়নি। কার্যত কিন্তু খুব অল্পের জন্যই ভারতের হাত থেকে জয়গৌরব শেষপর্যন্ত ফশকে যায়। খেলা ড্র। বেংসরকার ১৪৬ রান করে অপরাজিত রয়ে গেলেন।

তার আগে যে কী তুমুল উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল, তা তোমরা জানো। জয়, পরাজয় আর ড্র, এই তিন রকমের সম্ভাবনার মধ্যে শেষ দিনের খেলা সারাক্ষণ দারুণভাবে দুলেছে। কিন্তু এরই নাম ক্রিকেট!

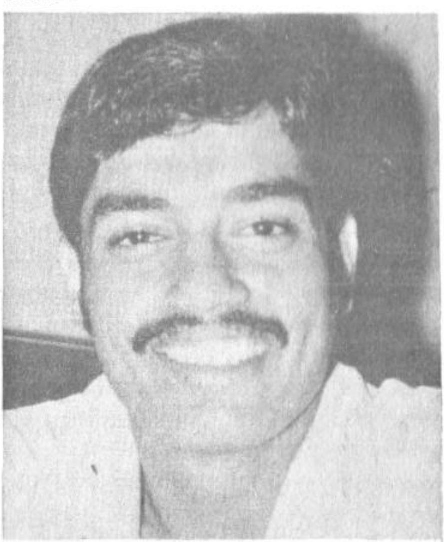

বেঙ্গসরকার (ম্যান অব দি ম্যাচ)

ধানি সারতিকা

আশি মিনিটের জোর লড়াই

অলোক দাশগুপ্ত

সম্প্রতি প্রকাশকে আবার খেলতে দেখা গেল কলকাতায়। প্রকাশ তাঁর সেরা খেলা দেখাতে পারলেন না। ভারত, ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া এবং ইংল্যান্ডের (শুধু দুজন মহিলা) খেলোয়াড়দের নিয়ে পঞ্চম এবং শেষ আমন্ত্রণমূলক ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের আসর বসেছিল নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ১৫—১০ পয়েন্টে প্রথম গেমে এগিয়ে থেকে প্রকাশ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ম্যাচ হেরে যান ইন্দোনেশিয়ার ধানি সারতিকার কাছে।

ফাইনালে প্রকাশ একগাদা সার্ভিস নষ্ট করেছেন এবং ওঁর বেশ কিছু ক্রস কোর্ট রিটার্ন কোর্টের বাইরে গিয়ে পড়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারেও প্রকাশের কিছু কিছু ত্রুটি চোখে পড়েছে। যখন স্ম্যাশ করলে সহজে পয়েন্ট আসত, তখন তিনি অযথা র‍্যালি চালিয়ে গেছেন।

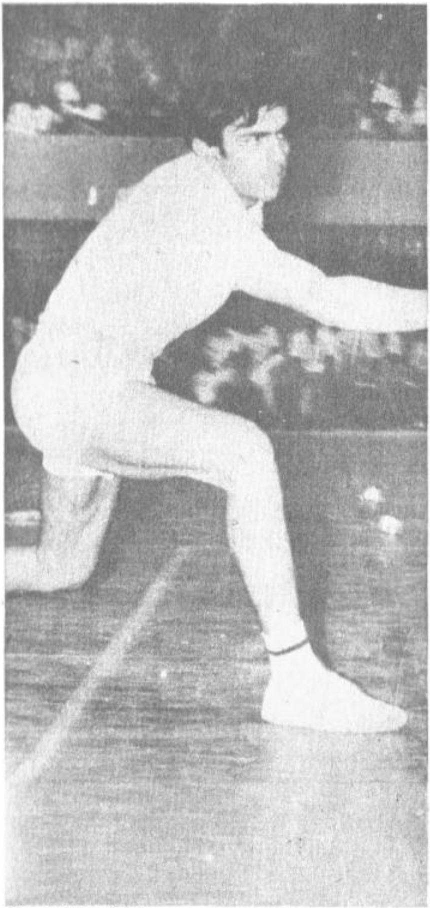

প্রকাশ পাড়ুকোন

খেলার পর প্রকাশ নিজেই বলেছেন যে, এই খেলায় তিনি মোটেই খুশি হতে পারেন নি। কথাটা মিথ্যে নয়, তিনি এমন অনেক ভুল করেছেন যা তাঁর মতো খেলোয়াড়কে মানায় না। প্রকাশ অভিযোগ তুলেছেন, যে-পালকের বলে খেলা হয়েছে, তা মোটেই আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের উপযোগী নয়। তাছাড়া নেতাজি স্টেডিয়ামের আলোও তাঁকে সমস্যায় ফেলেছিল। তিনি একটু দেরিতে বল দেখছিলেন।

টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে প্রকাশ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। দিন পনেরো ব্যাডমিন্টনের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। বিদেশী খেলোয়াড়দের মোকাবিলা করার জন্য কয়েকদিন বিশ্রাম এবং উপযুক্ত প্র্যাকটিসের দরকার ছিল প্রকাশের, কিন্তু তিনি সে-সুযোগ পাননি।

তবে, প্রকাশের সঙ্গে ধানির ফাইনাল খেলার স্মৃতি কলকাতার দর্শকের কাছে অক্ষয় হয়ে থাকবে। আশি মিনিটের এমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহসা চোখে পড়ে না। তীব্র স্ম্যাশে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়ে কখনও ধানি এগিয়ে গেছেন, কখনও নিজের কর্তৃত্ব জাহির করেছেন প্রকাশ। হলফ করে কেউ বলতে পারেননি যে, শেষ পর্যন্ত কে জিতবেন!

দু বছর আগে চীনারা খেলা দেখিয়েছিলেন এই নেতাজি স্টেডিয়ামে। সেই খেলা দেখে মনে হয়েছিল, স্পীড এবং পাওয়ারই বোধ হয় ব্যাডমিন্টনের শেষ কথা। কিন্তু প্রকাশ এবং ধানি দেখিয়ে দিলেন যে, স্পীড-পাওয়ারের সঙ্গে স্ট্রোক প্লের সমন্বয় ঘটিয়েই ব্যাডমিন্টনকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালের পাশে পুরুষদের ডাবলস ফাইনালটিকে নিতান্ত ম্লান দেখিয়েছে। একতরফা খেলে ধানি এবং হাদিয়ানতোকে সহজেই হারিয়েছেন কারতোনো এবং হারিয়ানতো জুটি। ইন্দোনেশিয়ায় এঁদের স্থান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জুন জুন-ওয়াজুদি এবং ক্রিস্টান-আদিচন্দ্রা জুটির ঠিক পরেই।

মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে দারুণ লড়াই হয়েছে দুই ইন্দোনেশিয় তরুণী ইভানা এবং গোয়ানের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত গোয়ান জয়ী হলেও বেশি করে চোখে পড়েছে ইভানার খেলা। বেশ চটপটে এবং হাতে মার আছে ইভানার। যেভাবে ১১—১ পয়েন্টে প্রথম গেমটি জিতেছিলেন তাতে মনে হয়েছিল, উনি ম্যাচ অনায়াসে জিতে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোয়ানের অভিজ্ঞতারই জয় হয়েছিল। সপ্তাহখানেক আগে হায়দরাবাদে ইভানা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কলকাতায় গোয়ানের বিরুদ্ধে ফাইনালে শেষ দিকে ওঁকে কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

অবশ্য একটু পরেই সেই ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে গোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে অনায়াসে মহিলাদের ডাবলস জিতলেন ইভানা।

ডুরান্ড-ফাইনালে প্রসূন বল নিয়ে এগোচ্ছেন

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

প্রসূনের বাঁ পা

অশোক দাশগুপ্ত

উনিশশো সাতাত্তরে নিরঙ্কুশ ত্রিমুকুট পেয়েছিল মোহনবাগান। তবু কালির ছিটে ছিল ঘরোয়া লীগের বিপর্যয়ে। এবার কলকাতায় লীগ আর শীল্ড জিতে দার্জিলিঙের পাহাড়চূড়া থেকে অনায়াসে গোল্ড কাপ নামিয়ে আনে। কিন্তু ডুরাণ্ডে দ্বিতীয় ম্যাচেই বিরাট ধাক্কা—পুল ম্যাচে ফাগোয়ারার জে সি টি-র কাছে পরিষ্কার দু' গোলে হেরে গেল মোহনবাগান। গোল করেন প্রথমার্ধে পারমিন্দার এবং দ্বিতীয়ার্ধে কাশ্মীরা সিং। পাঞ্জাবকেশরী ইন্দার সিং এই বয়সেও মোহনবাগান ডিফেন্সকে ভুলের ফাঁদে জড়ান।

প্রথম ম্যাচে ওরকের বিরুদ্ধে উলাগানাথনের দেওয়া একমাত্র গোলে জিতেছিল মোহনবাগান। পুলের তৃতীয় ম্যাচ রাজস্থান পুলিসের বিরুদ্ধে—যারা জে সি টি-র মতো শক্তিশালী টীমের বিরুদ্ধে খেলা ড্র রাখতে পেরেছিল।

হারের দিন ছিলেন না, তবে তারপরই বোম্বে পৌঁছে গেলেন বাঘা কোচ পি কে ব্যানার্জি। দারুণ প্র্যাকটিস। এবং খেলাও হল দারুণ। রাজস্থান পুলিস তিন গোলে হারল মূলত মোহনবাগানের দুই দুরন্ত ডানা মানস-বিদেশের দাপটে। অসুস্থ বিদেশ টীমে ফিরেই অপ্রতিরোধ্য হলেন। গোল করলেন গৌতম সরকার, মানস ভট্টাচার্য এবং বিদেশ বসু। মোহনবাগানের গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে আর এল জে সি টি।

অন্য গ্রুপে ছিল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স পাঞ্জাব পুলিস, মফতলাল এবং আই টি আই। বেশ সহজেই সেমিফাইনালে এসে গেল পাঞ্জাবের দুই টীম।

বিশেষত দিল্লির মাঠে পাঞ্জাবের টীমগুলিই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের প্রধান প্রতিপক্ষ। জে সি টি-র বিরুদ্ধে হারার পর মোহনবাগান ফুটবলাররা প্রতিজ্ঞা করেন, বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতেই হবে।

সেমি ফাইনালে বি এস এফ-এর বিরুদ্ধে মোহনবাগান খেলল অনবদ্য ফুটবল। জে সি টি-র পারমার ও ভাটিয়ার কড়া ধাতের খেলার সামনে গুটিয়ে-থাকা মানস ভয়কে জয় করলেন। বিদেশ এইদিনও বাঁ দিকে ঝড়

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে

ছোটদের মনের মতো বই

গিরিধারী কুণ্ডু ॥ বুলাই ৫৲
শংকর ॥ এক ব্যাগ শংকর ৭৲
প্রফুল্ল রায় ॥ সেনাপতি নিরুদ্দেশ ৫৲
পরিচয় গুপ্ত ॥ ভূত যখন পৃত ৪৲
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ সামন্ত বাড়ি ৬৲
ভূপেন ভট্টাচার্য ॥ বিচিত্র রূপকথা ৫৲
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ অক্ষরে অক্ষরে ৫৲
ফণিভূষণ আচার্য ॥ সোনার স্যুটকেস ৬৲
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ বনের আসর ৪৲
সুনীল চৌধুরী ॥ সুন্দর দুর্গমের পথে ৬৲
গিরিধারী কুণ্ডু ॥ দুষ্টু টুসটুসি ৫৲
জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী
বাংলা সাহিত্যে মা ৪৲
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
সিকেপিকেটিকে ৫৲
পরিচয় গুপ্ত ॥ ভৌতিক শিকার কাহিনী ৪৲
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ॥ অবিশ্বাস্য ৬৲
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
পিনুডিদার গপ্পো ৬৲
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ দুনিয়ার ঘনাদা ৬৲
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুন্দরবনের আতঙ্ক ৮৲
সুবীর রায়চৌধুরী ॥ মেলা থেকে ঝামেলা ৫৲

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত
জুল ভের্নের ॥ যত ঝক্কি যত ঝামেলা ১০৲
জুল ভের্নের শ্রেষ্ঠ গল্প ৭৲
স্তানিসোয়াভ লেম্
পৃথিবী কী করে বাঁচলো ৬৲
মরডেকাই রিচলার ॥ জেকব দুই-দুই আর ফণাধর দন্তপাটি মুখোমুখি ৬৲

দে'জ পাবলিশিং C/o দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি ৭৩ ফোন:৩৪-৫০৩৫

তুললেন। মানস আর বিদেশের গোলে হেরে গেল বি এস এফ।

অন্যদিকে, মোহবাগান-বিজেতা জে সি টি কিন্তু পাঞ্জাব পুলিসের কাছে অপ্রত্যাশিত-ভাবে হেরে গেল খেলার তিন মিনিটে দেওয়া বলবীর সিংয়ের গোলে। সুতরাং, ফাইনালে মোহনবাগানের সামনে পড়ল পাঞ্জাবের তৃতীয় শক্তি—পাঞ্জাব পুলিস।

অধিকাংশ ফুটবল-বিশেষজ্ঞর মতে, বি এস এফ এখন পাঞ্জাবের সেরা টীম। ভারতের নানা টুর্নামেন্টে তাদের সাফল্য সেই মতকেই সমর্থন করে। তাই মনে হয়েছিল, ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিসকে উড়িয়ে এবং গুঁড়িয়ে দেবে মোহনবাগান। কিন্তু পাঞ্জাব পুলিস হেরে গেলেও উড়ে যায়নি। অধিনায়ক ঝলমন সিং গোলরক্ষা করেছেন মরিয়াভাবে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের চৌদ্দ মিনিটে সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে একটি গোলায়— প্রসূন ব্যানার্জির বিখ্যাত বাঁ পা থেকে যেটি বেরিয়ে এসেছিল।

এবার কলকাতায় প্রায় সারা মরশুম ঝলমল করেছেন ডানদিকের উইং হাফ এবং উইঙ্গার—গৌতম সরকার আর মানস ভট্টাচার্য। দিল্লিতে বাঁ দিকের পালা—প্রসূন ব্যানার্জি এবং বিদেশ বসু। এ বছর লীগের মাঝামাঝি সময়েও মোহনবাগান-সমর্থকরা প্রসূনের খেলায় খুশি ছিলেন না। মোহন-বাগান-ক্যালকাটা জিমখানা ম্যাচের দিন দুপুরে ক্লাব টেন্টে বসে সুব্রত প্রসূনকে বলে-ছিলেন, "মন খারাপ করার কিছুই নেই। সীজনের তো সবে শুরু। শীল্ড, ডুরান্ড, রোভার্স—সব তো পড়ে আছে।" লীগের শেষের দিকেই হাওয়া ঘুরতে শুরু করে। দার্জিলিঙে প্রসূন খেলেন অনবদ্য ফুটবল। বাহরিনের বিরুদ্ধে ফিরতি ম্যাচে খেলে এসেছেন, সুরজিৎ সেনগুপ্তর মতে "জীবনের সেরা ম্যাচ"। আর দিল্লিতে তাঁর বাঁ পায়ের গোলাই কম্পটন দত্তর হাতে ডুরাণ্ড কাপ তুলে দেয়। আটাত্তরের এশিয়ান গেমসের আগে ক্যাম্প বসেছিল পাতিয়ালায়। একদিন ভোরে, প্র্যাকটিস ঠিকঠাক শুরু হবার আগে প্রসূনকে দেখলাম বাঁ পায়ের তলার অংশ দিয়ে বলে মৃদু কিন্তু ক্রমাগত টোকা মেরে যেতে। বুটের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে সুরজিৎ সেনগুপ্ত বলেছিলেন, "ও-রকম বাঁ পা ইণ্ডিয়ায় আর কারো নেই।"

নাইজার

দিদিমণি

নাইজার নদী পশ্চিম আফ্রিকার প্রধান নদী। এর দৈর্ঘ্য ২,৬০০ মাইল বা ৪,২০০ কিলোমিটার এবং এটি দৈর্ঘ্যে আফ্রিকা মহাদেশের নদীগুলির মধ্যে তৃতীয়। এই নদীটির অনেকগুলি স্থানীয় নাম আছে। উপনদী সহ নাইজার নদীর অববাহিকা ৭৩০,০০০ বর্গমাইল।

নাইজার নদীর উৎপত্তি হয়েছে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর থেকে মাত্র ১৫০ মাইল দূরে গিনির ফুটাজালোন উচ্চভূমি থেকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২,৮০০ ফুট উঁচু একটা ডাঙা ও গভীর খাত থেকে এই নদীটি বেরিয়েছে, তখন এর নাম টেম্বি। এই নদী প্রথমে উত্তর দিকে একশো মাইল বয়ে গেছে। তারপর এই নদী উত্তর-পূর্ব দিকে বেঁকে কয়েকটি উপনদীর সঙ্গে মিশেছে। ডান তীরের উপনদীগুলির নাম—মাফউ, নিয়ানদান মিলো, সানকারানি। বাঁ তীরের উপনদীটির নাম টিনকিসো। মালি রাষ্ট্রে গিয়ে এই নদীর উচ্চভাগ শেষ হয়েছে। এরপরের চল্লিশ মাইলে নাইজার নদী প্রায় এক হাজার ফুট নীচে নেমে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। এই অংশে আছে দুটি জলপ্রপাত, নাম সোটুবা এবং কেনি। এর পরে নদী আরও উত্তর-পূর্বে বেঁকে প্রায় ১,০০০ মাইল বয়ে গেছে। মোপাটিতে পৌঁছে এই নদী ডান তীরের দীর্ঘতম উপনদী বানীর বঙ্গে মিশেছে।

টিম্বাকটুতে গিয়ে পৌঁছবার পরে এই নদ হ্রদ ও জলাভূমি শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর পরে নদী পূর্ব দিকে বেঁকে যাচ্ছে এবং বাঁ তীরের খানিকটা অংশে আছে সাহারা মরুভূমি। টিম্বাকটু থেকে ২৫০ মাইল বয়ে যাওয়ার পর একটি পর্বত শ্রেণী এই নদীর গতিপথে এসে পড়ায় নাইজার নদী এক মাইল লম্বা, আটশো ফুট চওড়া এবং কোথাও কোথাও একশো ফুট গভীর গিরিখাত খনন করেছে। এখানে নদীর স্রোত বেশি থাকায় জন্যে নৌকা চলাচল করা বিপজ্জনক। এর পরে নদীখাত চওড়া হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বেঁকে যখন গাওতে গিয়ে পৌঁছয় তখন এর প্লাবনভূমি তিন থেকে ছ-মাইল চওড়া হয়ে যায়। টিম্বাকটু থেকে চারশো ত্রিশ মাইল দূরেও কয়েকটি জলপ্রপাত ও খরস্রোত থাকায় কিছুদূর পর্যন্ত নৌকা চলাচল করতে পারে না। নাইজার রাষ্ট্রে প্রবেশ করার পরে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত নদী আবার নৌকা চলাচলের উপযুক্ত।

জেম্বা থেকে নাইজার নদীর নিম্ন-প্রবাহ আরম্ভ হয়েছে। পাঁচ থেকে দশ মাইল চওড়া প্লাবন-ভূমিতে অগভীর খাত সৃষ্টি করে নদী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বয়ে চলে। সত্তর মাইল দূরে কাদুনা নদী এসে মিশেছে নাইজার নদীর সঙ্গে, এই নদী নাইজার নদীর নিম্নভাগে প্রচুর জল সরবরাহ করে। নাইজিরিয়ার কাওয়ারা রাজ্যের লোকোজাতে নাইজার নদী তার বৃহত্তম উপনদী বেনিউয়ের সঙ্গে মিশেছে। বেনিউ নদীর জল নাইজার নদীতে এসে মেশার ফলে এর জলের পরিমাণ প্রায় দু'গুণ বেড়ে গেছে। এর পরে নদী নানা ধরনের শিলার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে এবং নদীর এই অংশেই আছে ওনিটশা শহর। নাইজার নদীর বদ্বীপ আফ্রিকার সব নদীর বদ্বীপের চেয়ে বড়। বদ্বীপে গিয়ে নাইজার নদী থেকে যে শাখানদীগুলি বেরিয়েছে তার মধ্যে নান নদীকেই নাইজার নদীর মূল শাখা বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

নাইজার ও তার উপনদীগুলিতে অনেক রকমের মাছ দেখতে পাওয়া যায়। নাইজার নদীতে জলহস্তী এবং অন্তত তিন রকমের কুমির আছে—এর মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র ধরনের কুমির হল নাইলে ক্রোকোডাইল। নদীর ধারে অনেক রকমের পাখি দেখা যায়।

বাঘা ১

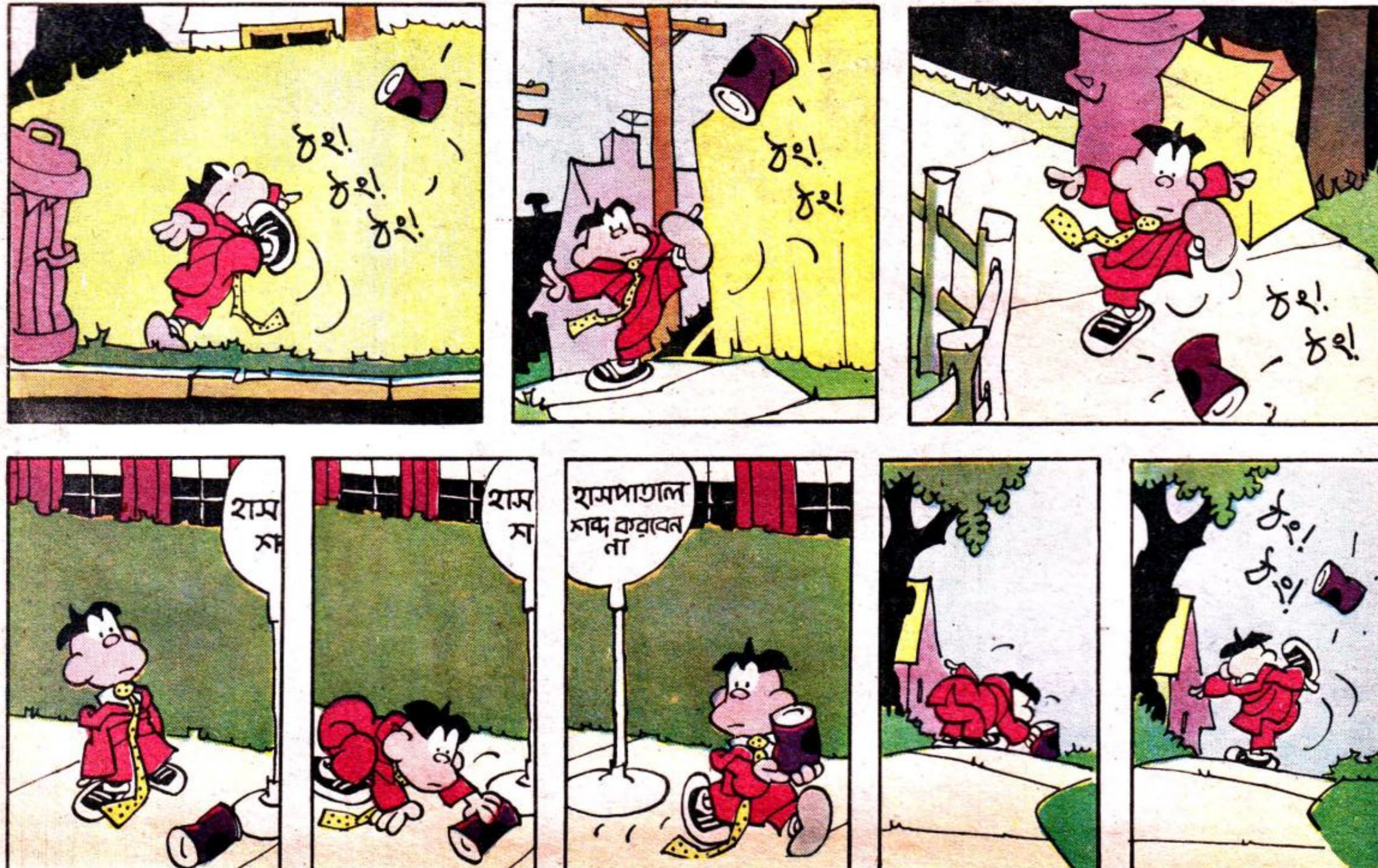

পাড়ার জঞ্জাল সাফ করছি!
বাঃ, তুই খুব লক্ষ্মী!
শাবাশ !!
তোর মেডেল পাওয়া উচিত!
জঞ্জাল হটাচ্ছি!
চুইং গাম দিলে তোর ঠেলায় আমাকে চড়তে দিবি?

দুষ্টুমী করার
এইতো বয়স
অ্যাডভিটামিন মালিশ করুন,
হাজার দুরন্তপনা সত্ত্বেও
স্বাস্থ্য অটুট থাকবে
বাড়ন্ত ছেলে-মেয়েরা দুষ্টুমী করবে— এটাই তো স্বাভাবিক। রোদে খেলবে, বৃষ্টিতে ভিজবে, খাওয়া নিয়ে গণ্ডগোল করবে—. এটাই তো নিয়ম। এতে ভাবনার কিছু নেই। সারা বছর নিয়ম করে অ্যাডভিটামিন মালিশ করুন। এই তেলের 'এ' ও 'ডি' উপাদান শরীরকে দুরন্তপনার সব চোট থেকে বাঁচাবে। ত্বক খসখসে হতে দেবে না, হাড় মজবুত করবে।
ADVITAMIN
FOR GROWTH AND VIGOUR OF THE BABIES
AD
VITAMIN
MASSAGE OIL
FORTE
SUNNY
সানি ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড

ছুটির দিনের মজা

প্রসাদ

রবিবার। বেলা সাড়ে-নটা। নীল আকাশ ঝকঝক করছে। কোথাও মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই। চম্বলের তাই আজ খুব ফূর্তি। দেখা গেল সে তার সাইকেলটি বের করে কোথায় যেন যাবার জন্য তৈরি।

Milly: Where are you going?
Chambal: Out.

তার এখন বেশি কথা বলবার সময় নেই। কিন্তু বেরোবার মুখেই বাবার সঙ্গে দেখা। কাজেই আরেকটু সময় খরচ করতেই হল।

Father: Where are you off to, Chambal? You seem to be in a great hurry.
Chambal: I'm going to Indranil's house, Dad.
Father : Indranil ? Do I know him?
Chambal: I don't think so, Dad. But he's a very good friend of mine.
Father: Is he? Why don't you ask him to tea some day, then ?
Chambal: May I, Dad? I'm sure he'll be very glad to come.
Father: And I'm sure Mother will be very glad to have him. So shall I.
Chambal: Good. I'll tell Mother.

এ পর্যন্ত তো ভালই হল। কিন্তু এর পরই বাধল গন্ডগোল। সাইকেলে চাপতে যাবে চম্বল, এমন সময়ে বাধা পড়ল।

Father: Just a minute, Chambal. What's the time now?
Chambal : I don't know Dad. Almost ten, I suppose.
Father: Oughtn't you to be doing your lessons now? Have you done your home-work?
Chambal: Oh, yes, Dad. I've finished it. Please, may I go now? It's very important.
Father : Really ? May I ask why ?
Chambal: We're going to have a picnic!
Father: Who will be at the picnic?
Chambal: Indranil and his sister Malabika and one or two other friends.
Father: Where are you going to have it?
Chambal: There's a beautiful garden at the back of Indranil 's house. We'll have the picnic there.
Father : Well, it sounds quite nice. When will you be home ?

চম্বলদের পিকনিকের কথা পরের বার হবে। এখন এই কথাটা লক্ষ করো :

Oughtn't you to be doing your lessons now ?

এ কথাটা এ-ভাবেও বলা যায় :

You ought to be doing your lessons now, oughtn't you?

[Oughtn't you=ought you not]

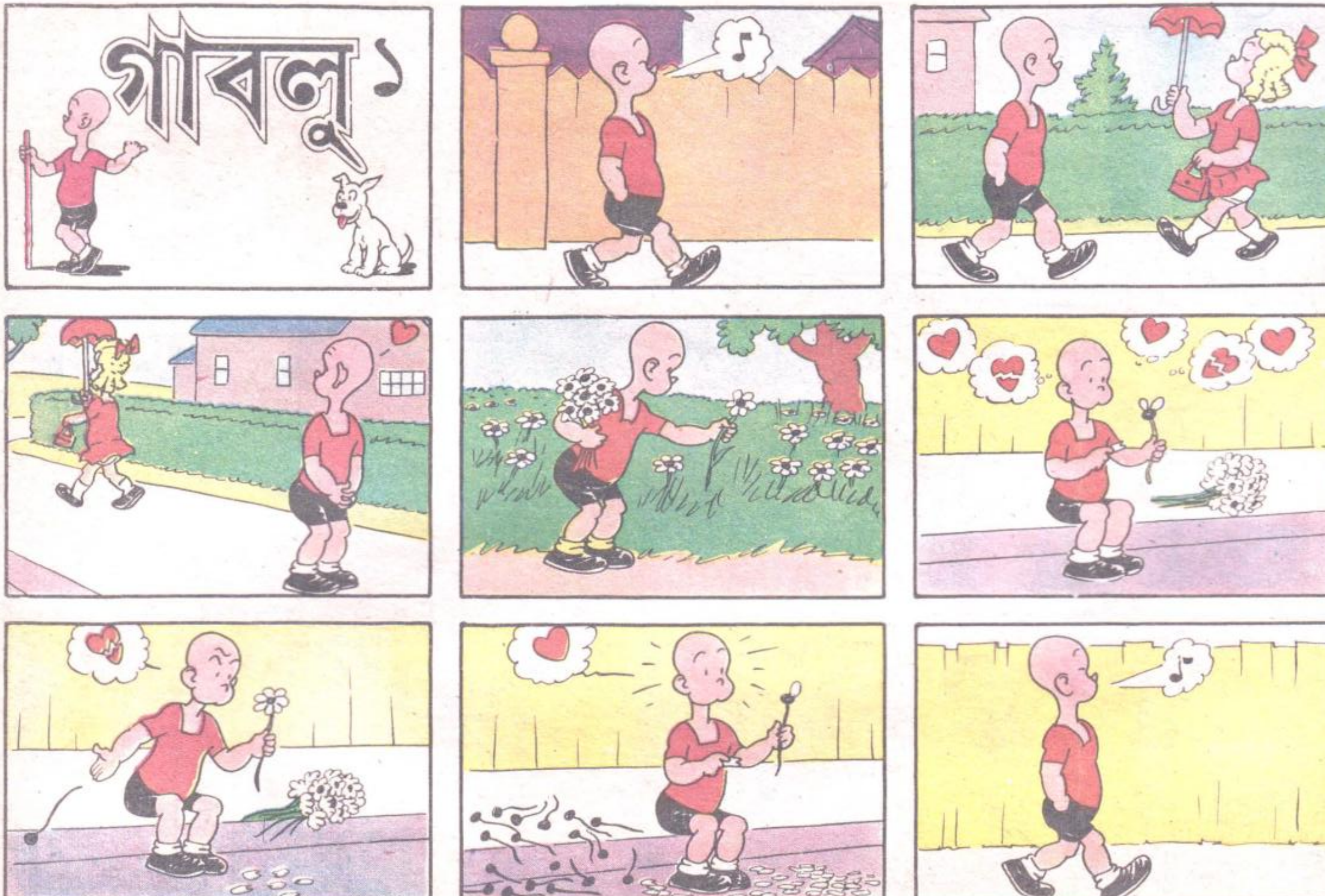
গাবলু ১

গাবলু ২
দর্জির দোকান
চটপট ধোলাই আর ইস্ত্রি
চটপট ধোলাই আর ইস্ত্রি
দর্জির

সিঁড়ির ধাপ—আরও

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

আগের সংখ্যায় দুই সরল রেখার মধ্যে দাঁড়ির মতো "ঘ" চিহ্নিত রেখা পড়েছে। এবার সেই "ঘ" রেখাকে তোমার ইচ্ছেমতো মাঝামাঝি কোথাও ভাগ করে নিয়ে আর-একটা সরল রেখা আড়াআড়ি ভাবে তৈরি করে নাও "চ" থেকে "চ" পর্যন্ত জুড়ে। (নীচে বড় করে দেওয়া নমুনা দেখলেই বুঝলে পারবে)।

"ঘ" চিহ্নিত রেখাকে ভাগ করার সময় নীচের অংশ কম ও ওপরের অংশ বেশি রাখলে সিঁড়ির ধাপটি সমানভাবে পাতা আছে বলে মনে হবে। এর উলটো করলেই দেখবে সিঁড়ি যেন ঘাড়ের ওপর পড়ছে।

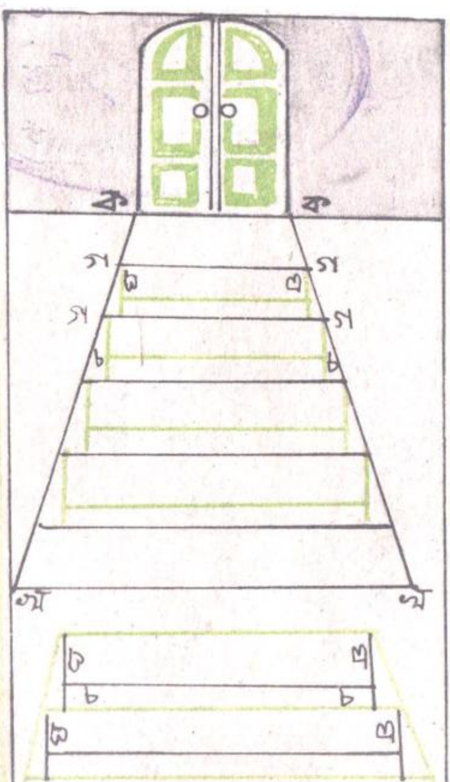

বাঁশের কাজ—ফুল

কারিগর

গতবার ফুল তৈরি করে রেখেছ। এবার কাজ আরম্ভ করো পাতার জন্যে। পাতলা বাঁশের পাতি তৈরি করে নাও দরকারমতো। পাতার ধারালো কাজের জন্য ফরমা তৈরি করে, তাকে পাতির ওপর বসিয়ে ('খ' ছবি)। পাতা তৈরি করে নাও প্রয়োজন অনুযায়ী। এবার ইচ্ছে করলে একটি কাঠিতে বেশ কয়েকটা পাতা গুচ্ছ করে বেঁধে নিতে পারো। ('খ' ছবি)। এবার তৈরি করে রাখা ডালগুলোকে ফুলসাজানোর পাত্রে খানিক ভিজে মাটি দিয়ে গেঁথে দাও। ফুলের আগে গুচ্ছ পাতাগুলো উঁচু নিচু করে সাজিয়ে গেঁথে নিয়ে পরে কম-বেশি করে ফুল গাঁথলে সুবিধে হবে। সব সাজানো হয়ে গেলে সাদা-লাল বা কালো কুচি পাথর বা নুড়ি দিয়ে সমস্ত পাত্রটা ভরাট করে বসার ঘরে বসিয়ে দিয়ে সবাইকে অবাক করে দাও।

জেনে রাখো—(১) নানান রঙে ফুল সাজালে বাহার বাড়বে। (২) ইচ্ছে করলে তোমার নকশা দিয়ে ফুল তৈরির কোথাও বাধা নেই।

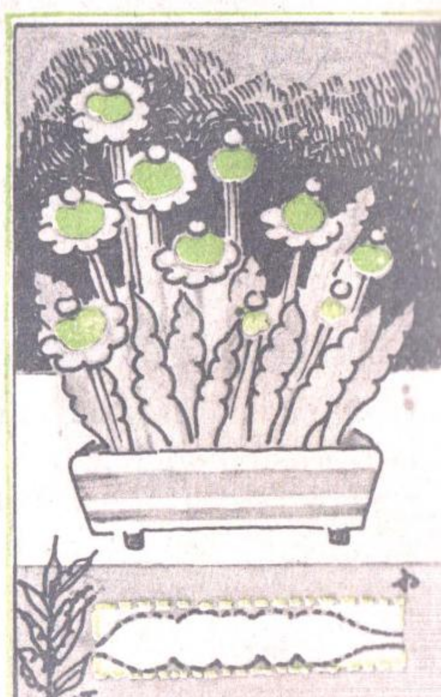

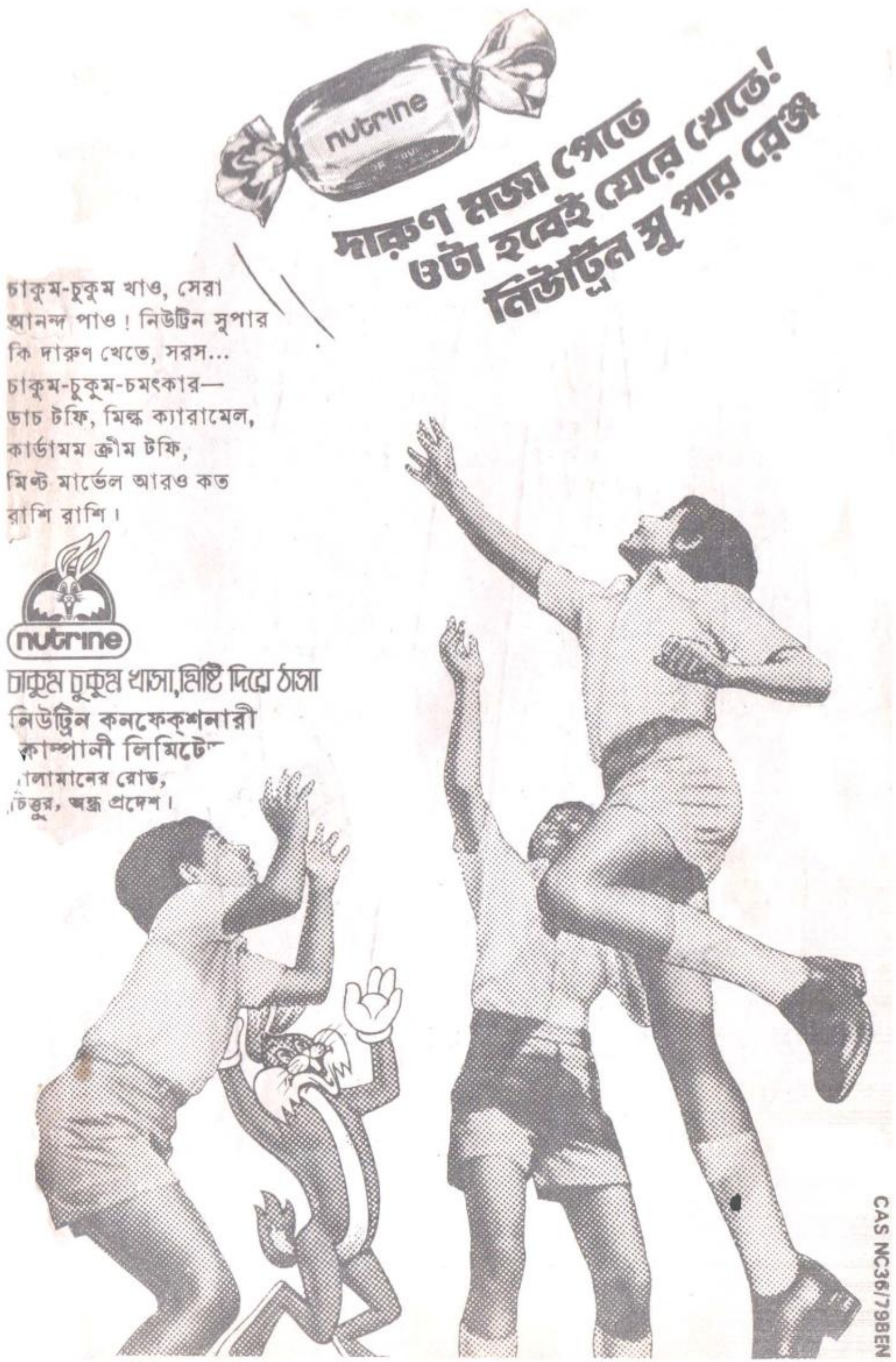
nutrine
দারুণ মজা পেতে
ওটা হবেই যেরে খেতে!
নিউট্রিন সুপার রেঞ্জ
চাকুম-চুকুম খাও, সেরা
আনন্দ পাও ! নিউট্রিন সুপার
কি দারুণ খেতে, সরস...
চাকুম-চুকুম-চমৎকার—
ডাচ টফি, মিল্ক ক্যারামেল,
কার্ডামম ক্রীম টফি,
মিন্ট মার্ভেল আরও কত
রাশি রাশি।
nutrine
চাকুম চুকুম খাসা, মিষ্টি দিয়ে ঠাসা
নিউট্রিন কনফেক্শনারী
কাম্পানী লিমিটে
লামানের রোড,
চিত্তুর, অন্ধ্র প্রদেশ।
CAS NC36/79BEN

everest/79/PP/26